সাবালক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পি, কে, বসু য়্যাণ্ড কোং
কলিকাতা—৩১

—এগারো সিকা—

পি, কে, বসু কর্ত্তৃক ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১ হইতে প্রকাশিত এবং
পুলিনবিহারী টাটু কর্ত্তৃক বরাহনগর, এইচ, এস, প্রেস হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

গীতা, বাণী, মায়াকে—

এই লেখকের—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্

মনে ছিল আশা

বহ্নিবিচিত্র

রাত্রির তপস্যা

নববধূ

নব-যৌবন

কোলাহল

স্মরণীয় দিন

রজনীগন্ধা

পুরুষ ও রমণী

চতুর্দ্দোলা

প্রভাতসূর্য্য

স্বর্ণমুকুর

দুর্ঘটনা

ভাড়াটে বাড়ী

কাছে আছে যারা

প্রেরণা

মিলনান্ত

জ্যোতির্ময়ী

শ্রেষ্ঠ-গল্প

সাবালক

দেবেন্দ্রনাথ একটার পর একটা শূন্য ঘরে ঘুরতে ঘুরতে পাগলের মত হা হা করে হেসে ওঠেন আপন মনেই। তবে পাগলের সঙ্গে তফাৎ এই যে, সে হাসির সঙ্গে দুচোখে জলও ছলছল করছিল। পাগলেরা শুধুই হাসে।

বাস্তবিক পাগল হতেই বা বাকী কি তাঁর?

দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন। এত বড় শূন্য বাড়ীটাতে রইলেন তিনি, তাঁর বুড়ো চাকর রঘু এবং আরও বুড়ো ঠাকুর তেওয়ারী। অথচ এরই জন্য কি তিনি এতদিন ধ'রে সাধনা করে এসেছেন, ধীরে ধীরে, নিজের সমস্ত সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে? এই পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাবার তপস্যা করেছেন তিনি—আর কোন দিকে না চেয়ে? হ্যাঁ, তপস্যা, তপস্যাই করেছেন তিনি। নিজের আর সমস্ত হৃদয়বৃত্তিকে কঠোরভাবে দমন করতে হয়েছে—কোন দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পাননি—এক মনে, একাগ্র হয়ে সাধনা করে গেছেন।

তবু, এ পরিণামও তিনি জানতেন বৈকি!

গত দশ বারো বছর ধরেই ত এই আশঙ্কা করছেন। বরং বলা চলে অপেক্ষা করছেন। তবে আর দুঃখ কি? ব্যর্থ হবে জেনেই ত তাঁর তপস্যা।

দেবেন্দ্রনাথ একটু বেশী বয়সেই বিয়ে করেছিলেন। যথেষ্ট সঙ্গতি না হ'লে বিয়ে করবেন না এই প্রতিজ্ঞা ছিল বলেই অত দেরি করতে হয়েছে। এই বিরাট বাড়ি, গাড়ি, বড় ব্যবসা—সবই তিনি

করেছেন নিজের চেষ্টায়, তাই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের আগে বিয়ের কথা ভাববারই সময় পাননি।

তবে তাতে তাঁর দুঃখ ছিল না, স্ত্রী পেয়েছিলেন মনের মতন —রূপে, গুণে। মনে হয়েছিল এতদিনের সমস্ত তৃষ্ণা মেটাবার মত অমৃত পাত্র ভরেই দিয়েছেন ঈশ্বর তাঁকে। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টক্রমে সে অমৃতভাণ্ড ভেঙে গেল—স্ত্রী মারা গেলেন বিয়ের ঠিক তিনটি বছর পরেই—দু বৎসরের পুত্র-সন্তান মণিকে রেখে।

মণি!

মণিই বটে। তাঁর সাত রাজার ধন, তাঁর সাপের মাথার মণি, তাঁর সাগর-ছেঁচা মাণিক। নারায়ণের উষ্ণীষ থেকে খসে পড়া রত্ন।

মাখনের ডেলার মত সে শিশু, বিস্ময়কর, আশ্চর্য!

জন্মের পর থেকেই তাকে দেখে বিস্ময় দেবেন্দ্রনাথের। প্রথম হাতটি নাড়া, প্রথম হাসি, প্রথম অস্ফুট স্বর ওর কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসা—সবই ত তাঁর মনে আছে এখনও, স্পষ্ট। যেন সেদিনের কথা। তারপর তার সেই উপুড় হতে শেখা, মাথা ঠেলে উঠে যাওয়া ওপরের দিকে, প্রথম সেই অকারণ, অবোধ হাসি। ফুলো ফুলো টোলখাওয়া গালে সেই ভুবন ভোলানো হাসি—সমস্ত জীবন, সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ করা যায় সে হাসির জন্য।

মণির মা যখন মারা যান তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স হলেও এমন বয়স হয়নি যাতে আর একবার বিয়ে করা অসম্ভব হ'ত। ধনী এবং স্বাস্থ্যবান পাত্রকে মেয়ে দেবার জন্য সবাই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বিয়ে তিনি সেদিন করতে পারেন নি মণির জন্যই।

তিনি স্বাবলম্বী, নিজে উপার্জন করে, নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছে সুতরাং বহু দেখতে হয়েছে তাঁকে, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তাঁর

বিচিত্র। তিনি জানেন যে এই রকম অবস্থাতে ছোট ছেলেমেয়ে সামলাতে না পেরেই অনেকে আবার বিয়ে করে—সবাই না হোক, অনেকে সত্যি-সত্যিই তাদের মানুষ করবার উদ্দেশ্যেই বিয়ে করে। কিন্তু সেটা যেমন সত্য, এটাও তেমনি সত্য যে—মানুষ তারা হয় না। একটি স্ত্রীলোকের সন্তানকে আর একটি স্ত্রীলোক কিছুতেই নিজের সন্তানের মত নিতে পারে না। উপেক্ষায়, অনাদরে, দুর্দশার মধ্যে বাড়তে থাকে তারা; সন্তানের বাপেরও তখন নতুন মোহ, নতুন সন্তান এসে তাঁকে বিভ্রান্ত করে দেয়। আসল উদ্দেশ্যটা যায় কোথায় হারিয়ে।

তাঁর মণিকে সে সম্ভাবনার মধ্যে ফেলতে পারবেন না তিনি—কিছুতেই।

হয়ত তেমন কোন মেয়ে কোথাও আছে—কিন্তু যদি তাকে খুঁজে পাওয়া না যায়? এ ঝুঁকি তিনি নিতে পারবেন না—মণির ভবিষ্যৎ নিয়ে জুয়া খেলার সাহস তাঁর নেই। সুতরাং সেদিক দিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনই তাঁকে যাপন করতে হয়েছে সেই থেকে। একবার খুবই প্রলোভনে পড়েছিলেন, এক কর্মচারীর গৃহে অতিথি হতে হয়েছিল বিদেশে গিয়ে, তার বয়স্কা বোনের যত্ন সেবা এবং বিবেচনায় তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। দাসী চাকরের অনিচ্ছার সেবাতে যার দিনের পর দিন কাটে, তাঁর বুভুক্ষু এবং তৃষ্ণার্ত হৃদয় এই মেয়েটিকে দেখেই তার হাতে নিজের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের সব ভার ছেড়ে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন মনে মনে যে, এই ধরণের মেয়েই জীবনে সুখী করার মত সঙ্গিনী। হায় রে! সেদিন যদি সাহস ক'রে তার পাণিগ্রহণ করতে পারতেন! তাহলে আজ হয়ত আর এমন করে শূন্য ঘরে ঘুরে বেড়াতে হ'ত

না। কিন্তু সেদিনও তা হয়ে ওঠেনি মণির জন্যই—সাত বছরের ছেলে, এই মেয়েটি সম্বন্ধে তাঁর দুর্বলতা অনুভব করেই বোধ হয়, কেমন একরকম বিরূপ হয়ে উঠল, তিনি আর সাহস পেলেন না বিয়ে করতে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেই চলে আসতে হয়েছিল। শুধু সেই কর্মচারীটিকে ডেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার ভগ্নির বিবাহের জন্য তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন গোপনে। জীবনের সাত-আটটি মধুর দিনের মূল্য দিয়েছিলেন ওটা।

তবু, তিনি কি খুব বঞ্চিত হয়েছিলেন ?

বোধ হয়, না।

মণি তার বুক ভরে দিয়েছিল। সমস্ত তৃষ্ণা মিটে গিয়েছিল ঐ এক অমৃতে।

একাধারে তাঁকে বাবা এবং মায়ের কাজ করতে হয়েছিল। রাত্রে ঝিয়ের কাছে রেখে স্বস্তি পেতেন না, নিজের কাছেই নিয়ে শুতেন। ফলে রাত্রে বার বার উঠতে হ'ত, কাঁথা পাল্টে দিতে হ'ত। ব্যবসার কাজ সেরে শুতে তাঁর রাত হয়ে যেত—কিন্তু তাই বলে বেলা অবধি ঘুমোবার অধিকার ছিল না; মণি ঘুমোত সন্ধ্যা থেকে সুতরাং তার ঘুম ভাঙ্গত ঠিক পাঁচটায়। তখনই উঠে তাকে খাবার দিতে হ'ত। মাখন মাখানো বিস্কুট আর সন্দেশ, এই ছিল তার তখনকার খাওয়া। আর সেই সঙ্গে এককাপ বিলিতি দুধ। তার জন্য ইলেক্ট্রিক স্টোভ জেলে জল গরম করতে হ'ত। দু-এক দিন ফ্লাস্কে জল রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে জলে বোধ হয় গন্ধ লাগত মণির, সে খেতে চাইত না। অত ভোরে ঝি-চাকরের ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করা বৃথা, তাহলে হয়ত তারা থাকবেই না।

সুতরাং প্রত্যহ এই কাজগুলি দেবেন্দ্রনাথকেই করতে হ'ত। তারপর আর ঘুমোনো সম্ভব হ'ত না। ছেলেকে সাজিয়ে নিজেও কাঁধে জামাটা ফেলে বেরিয়ে পড়তেন পার্কে। প্রথম প্রথম কোলে নিতে হ'ত—তারপর অবশ্য সে হেঁটেই যেত সঙ্গে সঙ্গে।

অফিসেও নিয়ে যেতেন ছেলেকে সঙ্গে করে। ঝি যেত বটে সঙ্গে কিন্তু তবু সেখানে ছেলে নিজের চোখের ওপর থাকত। এতটা সময় ওদের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা পেতেন না। নিজেরই অফিস—সুতরাং লজ্জিত হবার ভয় ছিল না। বড় বড় সাহেব-সুবোরা কিংবা কোন বড় মহাজন যখন অফিস-ঘরে ঢুকে সেই একরাশ খেলনার মধ্যে ঐ শিশুটিকে দেখে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাইতেন তখন অপ্রতিভ একটু হতেন হয়ত দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু তার জন্য ছেলেকে দূরে রাখার কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

এর ফলে অদ্ভুত একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তাঁদের দুজনের মধ্যে। ছেলের প্রতিটি চাহনির অর্থ তিনি বুঝতেন, চোখের পাতা কখন দ্রুত পড়ল তার ইতিহাস জানা থাকত তাঁর। শুধু অভাব নয়, কিংবা অভিযোগ নয়—প্রতিটি ইচ্ছা তার তিনি যেন বাতাসে অনুভব করতেন। চোখের পল্লবে অভিমান ঘনিয়ে আসবার আগেই তিনি সে বেদনা দূর করে দিতে পারতেন তাই। বোধ হয় সেদিন ছেলের দিক থেকেও তাই ছিল। বাপের দৃষ্টির ভাষা সে বুঝত—যতটুকু ছেলেও। তাঁর অপ্রসন্নতা আগে থেকে অনুমান করে নিয়ে সে সাবধান হ'ত। আবার তিনি ছিলেন তার বন্ধুও—যত মনের কথা সে গড় গড় করে বলে যেত তাঁকে—খুঁটিনাটি সমস্ত। তার জগৎ সেদিন ছিল যেন শুধু তাঁকে নিয়েই।

তিনিও বাইরের সমস্ত কর্ম-কোলাহলের মধ্যে থেকে নিজের খানিকটা সত্তা যেন পাঁচিল দিয়ে ঘিরে আলাদা করে রেখেছিলেন তাঁর শিশু পুত্রের জন্য। তার অসংলগ্ন এবং অসংখ্য বক্তব্য শোনবার সময় লক্ষ টাকার শেয়ারের খবর এলেও তা তাঁর কানে ঢুকত না। এরকম অনেক ব্যাপারে তিনি অনেক সময় মোটা লোকসান দিয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তিনি দুঃখিত হন্‌নি। ব্যবসায়ের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত, সমস্ত লাভ লোকসানের স্মৃতি ও দুশ্চিন্তা তিনি ভুলে যেতেন— যখন ছেলে মণি খেলা করতে করতে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরত তখন তার সেই ঘর্মাক্ত মাথায় একরাশ চুলের মধ্যে নাক এবং মুখ গুঁজে অপূর্ব তার গাত্রের সৌরভ নিতে নিতে এবং তার সেই একমুঠো ফুলের মত নরম দেহ বুকে চেপে ধরে।

তবু সেদিন তিনি এটা বুঝতে পারেন নি যে তাঁর স্বার্থপর মন ছেলেকে একান্ত ক'রে নিজের মধ্যেই মিশিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

সেটা আবিষ্কার করলেন একদিন হঠাৎ—

তখন মণির মাত্র সাত বৎসর বয়স। সেদিন কি একটা কাজের ফাঁকে সকাল বেলা হঠাৎ বাইরের ঘর থেকে ওপরে উঠে এসেছেন ছেলেকে দেখ্‌তে—পা টিপে টিপে এসেছেন, ইচ্ছেটা ওকে চমকে দেবেন, অকস্মাৎ খুশীতে ভরিয়ে দেবেন ওর মুখ। কিন্তু ঘরের দরজায় পা দিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। মণি চিরুনি নিয়ে আয়না বসানো একটা আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুল আঁচ্‌ড়াচ্ছিল। আঁচ্‌ড়ানোও তখন হয়ে গেছে, চিরুনিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে, কতকটা বা অবাক হয়েই চেয়েছিল নিজের মুখের সেই প্রতিবিম্বের দিকে। এখন আয়নার

মধ্য দিয়েই বাবার চোখে চোখ পড়তে একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি চিরুনিটা রেখে তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল।

সামান্য ঘটনা। কিন্তু অকস্মাৎ দেবেন্দ্রনাথের বুকটা যেন মুচড়ে উঠল। ছেলে বড় হয়েছে। ইতিমধ্যেই তার নিজের সম্বন্ধে সে সজাগ। নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে সে যেন দেখতে পেয়েছে। নিজের সম্পর্কে নিজের কৌতূহল প্রকাশ হয়ে পড়ায় তাঁর কাছে সে যেন লজ্জিত।

অর্থাৎ সূক্ষ্মতম একটা পর্দা পড়েছে তাঁর মন আর ওর মনের মাঝখানে। ছেলে এখন থেকেই দূরে সরে যেতে আরম্ভ হ'ল। শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যখন ওর মনের অনেক খবর থাকবে তাঁর অজ্ঞাত।

হয়ত এটা ছেলেমানুষী, অর্থহীন। অন্তত তাই বলেই মনকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু তবু মন যেন বোঝে না। কী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায়, সর্বনাশের কী একটা অপরিচিত ইঙ্গিতে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। অদৃশ্য কোন্ এক চক্রান্তকারীর ওপর বিদ্বেষ বোধ করেন তিনি, নাম না-জানা ঈর্ষার তীব্র বিষে জ্বলে যান।

আরও কিছুদিন পরে মণির বন্ধু জুটল।

ছেলেকে তিনি ইস্কুলে দেননি, বাড়িতেই দুজন মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন কিন্তু তবুও এই বন্ধুদের ঠেকানো গেল না। অবশেষে যেদিন আবিষ্কার করলেন যে, ছেলে তাঁর সঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে তার সঙ্গীদের সাহচর্য চায়, সেদিন তিনি আর বাধা দিতে পারলেন না। আরও দুচারদিন যাবার পরে বুঝলেন যে, ওদের সঙ্গ সে চায় বেশী করে। বাবার সম্বন্ধে তার একটা সসম্মান প্রীতির ভাব আছে মনে মনে ঠিকই, কিন্তু অন্তরের সমস্ত খবরের ভাণ্ডারী আর তিনি নন্—সে অন্তরঙ্গতা কখন্ গেছে নিঃশেষ হয়ে।

একটির পর একটি আঘাত আসে আর তিনি চমকে ওঠেন। এর কোনটাই অপ্রত্যাশিত নয় বরং একটার পিছনে যে আর একটা আছে শেকল বাঁধার মতই, তা তিনি আগেই জানতেন তবু তাঁর বেদনা বোধ হয় বৈ কি! বেত খাবার শাস্তি যে পেয়েছে, সে জানে ক'ঘা খেতে হবে, গুণেও যায় নিশ্চয় মনে মনে, একটা আঘাত পড়ার পর আর একটা আঘাত ঠিক ক'মুহূর্ত পরে আসবে তাও তার অজানা নেই, তবু ত তার জ্বালা তাতে কমে না। হয়ত নতুন অভিযোগ থাকে না, কিন্তু তাই বলে তার ব্যথা, তার দাহ? সে কোথায় যাবে!

ওঃ—এই নিয়ে কত ছেলেমানুষীই করেছেন তিনি।

ছেলের ওই বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও নেমেছেন। কতকগুলি চিন্তাশক্তিহীন, অপুষ্ট-মস্তিষ্ক, নাবালক কিশোরদের কাছ থেকে চেষ্টা করেছেন ছেলেকে ছিনিয়ে আনতে—কৌশলজাল বিস্তার করে চেষ্টা করছেন তার মনকে একান্ত ভাবে তাঁর দিকে ফেরাতে। অসম্ভব জেনেও এ মোহ ছাড়তে পারেননি, ছেলেমানুষী জেনেও একটা বিরাট ব্যাপারের মত চক্রান্ত করেছেন মনে মনে—একটার পর একটা পরিকল্পনা এবং ফন্দী ভেবেছেন।

তবু, তাই কি সম্ভব?

বরং সে আরও দূরে চলে গেছে। কত কথা, কত ব্যাপার দিন দিন সংখ্যায় বেড়ে গেছে—যা বাবার কাছ থেকে মণি গোপন করতে চায়। কত কি খুঁটিনাটি, মনোরাজ্যের একটা অংশে যা পৃথক সীমায় আবদ্ধ থাকে, যেখানে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। যার ইঙ্গিত মাত্র তিনি পান বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে চাপা হাসাহাসির মধ্যে, ত্রস্ত, চকিত গোপন পদসঞ্চারে—চোখের চাহনির মধ্যে গোপন করার প্রয়াসে। নিতান্ত তুচ্ছ কথা হয়ত, কতখানি তুচ্ছ তা তাঁর পক্ষেও অনুমান করা অসম্ভব

নয়, তবু তারই জন্য কী এক বোবাতুর ঈর্ষা তিনি অনুভব করেন—কী প্রচণ্ড অন্তর্দাহ। কত রাত্রি বিনিদ্র কাটে এরই জন্য।

ছেলে আর তাঁর কাছে শুতে চায় না আজকাল ; বিশেষ করে আগের ভাবে তাঁর বুকের মধ্যে, বাহুপাশের মধ্যে ত নয়ই। সেটা বুঝতে পারেন দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু না বোঝার ভাণ করেন। যতদিন না ইচ্ছাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ততদিন পর্যন্ত থাক না। যদিচ এ কাঙালপনার লজ্জা ও ব্যর্থতা নিঃশব্দে তাঁকে দগ্ধ করতে থাকে।

তারপর একদিন, সেদিনকার কথাটা তাঁর আজও মনে আছে বৈ কি, অকস্মাৎ লক্ষ্য করলেন ছেলের ঠোঁটের ওপর যেখানটা স্বাভাবিক একটা রেখা আছে বরাবরই, সেটা আর একটু নিবিড় হয়ে উঠেছে। বেশ ঘন একটি শ্যামল রেখা, বনান্তের যৌবন-স্বপ্ন বসন্তের আগমনের আভাস পেয়ে যেমন শ্যামল হয়ে ওঠে তেমনি হয়ে উঠেছে। কৈশোরের আভাস। যে কৈশোরের পিছনে আছে যৌবন।

ব্যবসা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব ঠেকে অর্থহীন। ঘরে-বাইরে কোথাও মন বসে না—কাজে নয়, বিশ্রামে নয়। বার বার নিজের এই স্বার্থপর, অসুস্থ, অস্বাভাবিক মনকে শাসন করার চেষ্টা করেন, ধমক দেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আর পাঁচজন বাপে যেমন স্বপ্ন দেখে ছেলে বড় হয়ে পয়সা রোজগার করবে, মানুষের মত মানুষ বলে গণ্য হবে, বিয়ে-থা ক'রে নাতি-নাতনীতে তাঁর ঘর ভরিয়ে দেবে—সে রকম তিনি পারেন না কেন ? কেন তিনি চান তাঁর ছেলেকে ছোট্ট করে, তাঁর ওপর নির্ভরশীল করে বুকের মধ্যে পুরে রাখতে ?

এর জবাব পান না কোথাও, তবু মন তার নিজের পথে চলে। আপনার কাঁদে আপনি পড়ে জর্জরিত, ক্ষত-বিক্ষত হয়।

আরও কয়েকদিন পরে হঠাৎ কী একটা জরুরী কাজের ফাঁকে অভ্যাসমত তাঁর ব্যাকুল সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছেলের মুখ খুঁজতে গিয়ে চমকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'ওটা কিরে? কিছু লেগেছে—? কাছে আয় ত দেখি।'

মণি বিস্মিত হয়ে বলে, 'কোথায় কি? তুমি মুহূর্তে মুহূর্তে কত কী যে দেখো!'

'ঐ যে গালের ঐ জায়গাটা, লাল মত—'

উত্তরের অপেক্ষা করেন না, ছেলে কাছে এগিয়ে আসবার আগে তিনিই এগিয়ে যান, 'এই যে এটা—'

মণি বেশ নিরুদ্বিগ্ন সহজ ভাবেই বলে, 'ও, ঐ টে? ও কিছু না, বোধ হয় একটা ব্রণ উঠছে। বাব্‌বা, যা করে উঠলে তুমি, আমি ভাবলুম না জানি কী হল!'

স্তম্ভিত, বিমূঢ় দেবেন্দ্রনাথ তাকিয়েই থাকেন।

শুভ্র, কোমল, মসৃণ মুখ, ফুলের মতই নিষ্পাপ ও মসৃণ—তার ওপর একটি রক্তবিন্দুর মতই ফুটে উঠেছে। হ্যাঁ, ব্রণই বটে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসন্ন যৌবন ও যৌনসচেতনতার আভাস বহন করে চাঁদের গায়ে কলঙ্কের মতই তাঁর খোকার মুখে ফুটে উঠেছে ব্রণটা।

কিন্তু তবু তা-ই সব নয়। খোকার মুখখানা তাঁর হাতের মধ্যে ধরাই থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন চিবুকের নীচেও একটি শ্যামল রেখা ঘনিয়ে এসেছে, আর তারই মধ্যে, ঠিক মাঝখানে একটি রুম যেন অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। সামান্য একটুখানি—তবু তা সুনিশ্চিত ভাবেই শ্মশ্রুর আগমন-বার্তা ঘোষণা করছে।

তা হ'ল বৈকি, চৌদ্দ পেরিয়ে মণি তাঁর পনেরোতে পড়েছে। ক্লাস নাইনে পড়ছে. আর এক বছর পরে ম্যাটি ক দেবে, তারপরই ত'

কলেজের ছেলে, ভদ্রলোক। তার নিজস্ব জগতে সে নতুন করে জন্মলাভ করবে, তার জীবনের রথ ধরবে তার নিজের সৃষ্টি করা রাস্তা; স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাঁর মণি নিজেকে খুঁজে পাবে ক্রমশ।

আর কত দিন তিনি বালক মণিকে ধরে রাখবেন নিজের বুকের কাছে?

সেদিন আর কোন কাজ হ'ল না। বিহ্বল দেবেন্দ্রনাথ ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে বসেই রইলেন নিজের টেবিলে—চুপ করে নিষ্ক্রিয়ভাবে। কাজ করার শক্তি আর তাঁর নেই। কর্মচারীদের জরুরী আহ্বানও আর তাঁকে সেদিন কর্মব্যস্ততায় উদ্বুদ্ধ করতে পারল না। কোথায় যেন মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে তাঁর, উৎসাহের ভিত্‌ বসে গেছে মাটির মধ্যে। আর কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

ছেলে স্নানাহার করে ইস্কুলে চলে গেল। তাঁকে বলে গেল না আজ, ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল। বাবার ভাবগতিক সে বুঝতে পারেনি সত্য কথা, কিন্তু এর সঙ্গে যে তার যোগাযোগ আছে সেটা সে বুঝতে পারে। বাবার এই পুতু-পুতু ভাব, এই একান্তভাবে আঁকড়ে থাকা তার মোটেই ভাল লাগে না। তার মন বিদ্রোহী হতে আরম্ভ করেছে বহুদিন থেকেই, শুধু চক্ষুলজ্জাতেই সে বলতে পারে না কিছু। বাবা পাগল—এ ধারণাটাও ইদানীং ওর মনে দেখা দিচ্ছে একটু একটু ক'রে, এসবের মানে কি? কি বলতে চান উনি? কী করেছে সে?

ওর এই মনোভাব বিজিতী দর্পণে প্রতিফলিত মুখচ্ছবির মতই স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখতে পান দেবেন্দ্রনাথ। সে যে আলাদা শোবার

প্রস্তাবটা বহুদিন থেকেই করতে চাইছে—ওঁর প্রতি একটা অনুকম্পা মিশ্রিত সঙ্কোচেই শুধু বলতে পারছে না, তাও তিনি জানেন।......

অনেকক্ষণ বসে বসে তিনি মন স্থির করে ফেললেন। এমন একটু একটু করে মরে লাভ কি? আঘাতটা একেবারে সওয়াই ভাল।

তাছাড়া প্রস্তাব ত আসবেই, ছেলের মুখ থেকে শোনবার আঘাতটা আর না-ই বা সইলেন। তার চেয়ে নিজের অদৃষ্টকে নিজেই ব্যঙ্গ করা ভাল। বহুক্ষণ বসে থাকবার পর সরকারকে ডেকে বললেন, 'আজই একটা ছোট সিঙ্গল্ খাট আর তার বিছানা কিনে এনো।......মণির বিছানাটা আলাদা করাই ভাল, ও বড় হচ্ছে, এখন হয়ত শুতে অসুবিধা হয়।'

সরকার বললেন, 'তা হলে ঐ দক্ষিণের ছোট ঘরটা—?'

'না, না, তা নয়' ব্যাকুল ভাবে বলে ওঠেন দেবেন্দ্রনাথ, 'অন্য ঘরে নয়। একেবারে অতটা পেরে উঠব না। আমারই ঘরে বরং ওধারের ড্রেসিং টেবিলটা সরিয়ে—যা হয় করে ধরিয়ে দিও।'

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। ব্যবধানটা কত অনায়াসে এবং কত দ্রুত বেড়ে গেল তা ভেবে দেবেন্দ্রনাথেরই অবাক লাগত। প্রথম দিন রাত্রে শুতে এসে স্বতন্ত্র শয্যার ব্যবস্থা দেখে চাপা আনন্দে ছেলের মুখ যে উজ্জল হয়ে উঠেছিল সেটা দেবেন্দ্রনাথের চোখে এড়ায়নি। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত মণি একটা মৌখিক প্রতিবাদ করবে, অন্তত একটু বিস্ময় প্রকাশ করবে, কিন্তু ততটুকু আশাও ব্যর্থ হল যখন—তখন মনে হল একটা গরম লোহার ছুরি তাঁর বুকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কে চালিয়ে দিলে।

তারপর আর বিশেষ ব্যথা পাননি, কেবল একটি দিন ছাড়া ; যেদিন হঠাৎ জামা ছাড়তে গিয়ে ওর বুক পকেট থেকে একটা সিগারেট ছিটকে পড়েছিল ওঁরই পায়ের কাছে, সেই দিন আবার একটা যন্ত্রণায় ওঁর মুখ বোধ হয় বিকৃত হয়ে উঠেছিল। তখন মণি ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ঢুকেছে, এ বয়সে সবাই ওটা ধরে, অনেকে আরও আগে ধরে—সুতরাং বলবার তাঁর কিছুই ছিল না। তবু কেন যে অমন মর্মান্তিক ব্যথায় শিউরে উঠলেন তা তিনিও জানেন না।

এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে নেই। একটির পর একটি গ্রন্থি খুলেছে—যেন আপনা আপনিই। গোণা বেত পিঠে পড়ছে, আরও পড়বে সে-ত জানা কথাই। শুধু মুখটা বিকৃত হয় চোখটা বোজে প্রত্যেক আঘাতে একবার ক'রে—এ ছাড়া একটা থেকে আর একটা আঘাতে এমন কোন তফাৎ আছে কি ?

ছেলে ইস্কুল ছাড়ল, কলেজে ভর্তি হল। তার খেলাধুলা, বই, বন্ধুবান্ধব, মাস্টার, সিনেমা প্রভৃতির নিশ্ছিদ্র প্রাচীরের মধ্যে তাঁর প্রবেশের দ্বার কই ? কথা কইবারই ত সময় হয় না। শুধু নতুন নতুন উপলক্ষ্য করে হাতখরচের টাকাটা যখন চাইতে হয়, তখনই বাবার কথা মনে পড়ে তার। বাবাকে সে করুণার চোখেই দেখে, বেচারী দিনরাত খেটে টাকা রোজগার করছেন, না আছে ঘরে স্ত্রী, না আছে বাইরে বন্ধু-বান্ধব। আর তাও করছেন তারই জন্য ; কিন্তু কী আর করা যায় ঐ একরকমের মানুষ উনি, টাকা ছাড়া আর কিছু ত চিনবেন না পৃথিবীতে।

কেবল একটি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ অটল ছিলেন। খাটটা মণি অন্য ঘরে সরাতে চেয়েছিল ; কিন্তু উনি কিছুতেই রাজী হননি। রাত্রে বিছানায় শুয়ে সিগারেট খেতে পারে না, তা ছাড়া অনেক রাত ক'রে বাড়ি

ফিরতে সঙ্কোচ বোধ হয়—বাবা কৈফিয়ৎ না চাইলেও লজ্জা করে, এসব কারণ ঢের ছিল ওর ঘর বদলের কিন্তু এই একটা জায়গায় সে তাঁকে নরম করতে পারেনি। মনের বাইরে ত গেছেনই তিনি, চোখের বাইরে যেতে রাজী নন। আর কিছু না হোক, গভীর রাত্রে উঠে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ত পারেন। সেদিকে চেয়ে চেয়ে দু-চোখ জ্বালা করে জল ভরে আসে সত্য কথা, তবু তাতেও শান্তি আছে। এটুকু ছাড়তে পারবেন না তিনি।

এরপর এল চরম আঘাত।

ছেলের মুখে চোখে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন তিনি। বহু দেখেছেন, না দেখলেও ছেলের মুখ দেখে বুঝতে দেরী হ'ত না। শঙ্কিত হয়ে শিউরে ওঠেন। থার্ড ইয়ারে পড়ছে, এইত মোটে উনিশ কুড়ি বছর বয়স।...এরই মধ্যে?

খবর নিয়ে জানলেন, এক বন্ধুর বাড়ি ইদানীং আনাগোনাটা বড্ড বেড়েছে। দিনেরাতের অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটে। তাদের সিনেমা দেখানো হয় প্রায়ই, ওর গাড়ীতে তারা হাওয়া খায়। উপহারের স্তূপ জমে উঠেছে সেখানে।

কারণটা অনুমান করতে বিলম্ব হ'ল না। আর একটু চেষ্টা ক'রে মেয়েটিকে দেখেন। সেই বন্ধুরই বোন। বয়স বোধ করি ওর চেয়ে কম হবে না। যদিও সেটা বোঝবার দৃষ্টি মণির নেই। এমনি সুশ্রী চেহারা, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে এবং কথা কইবার ধরণেই উনি বুঝতে পারেন, মেয়েটি ভাল না। স্বভাব চরিত্র ত ভাল নয়ই—সাংসারিক জীবনে পুরুষকে সুখী করতে পারে, শান্তি দিতে পারে, এমন কোন গুণও ওর নেই।

সেদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে থাকতে হ'ল ছেলের জন্য। মণি ফিরল এগারটার পর। উদ্‌ভ্রান্ত, অন্যমনস্ক দৃষ্টি। মুখে ক্লান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট তবু তারই পাশাপাশি একটা তৃপ্তি ও ব্যগ্র আশার ছবি ফুটে উঠেছে।

বাবাকে তখনও বসে থাকতে দেখে সে একটু অপ্রতিভ হ'ল। আর চমকে উঠল যখন তিনি ডেকে পাশে বসালেন। হয়ত একটু ভয়ও পেলে

দেবেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, 'মণি, তুমি যতীনের বাড়ি একটু বে
না আজকাল?'

মণি মাথা নীচু করে নিজের পায়ের বুড়ো আ
উত্তর দিলে, 'ওর সঙ্গে পড়লে পড়াশুনোর

'সকাল সন্ধ্যা, রাত্রি—এতক্ষণ পড়ে

মণি যেন এবার একটু বিরক্ত হ
পড়া ছাড়াও গল্প গুজব ত হ
বেশীই লাগে।'

দেবেন্দ্রনাথ শান্ত কণ্ঠেই
যাচ্ছ তুমি—এও শুনলাম

'তোমার গেয়েন্দাং
তার বদলে কিছু ত ক
আহ্লাদ হয়েই ওঠে

মণি উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত থেকে [illegible] ছাড়িয়ে নিয়ে একটু রাগ করেই বললে, 'ওরা গরীব ব'লে একটা ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে এ রকম ইঙ্গিত করা তোমার অন্যায় বাবা! তা আমাকে বলতেই হবে।'

দেবেন্দ্রনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়েন। আর কিছু জানবার

তাঁর, জানা হয়ে গেছে। মনে মনে নিজেকেই দোষ দেন, এর জন্য

তিনিই দায়ী। সমস্ত জগৎ থেকে আলাদা ক'রে রেখে, সমস্ত

অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি মানুষ করেছিলেন ছেলেকে।

এবং কোমল মন। সাধারণ চক্রান্তেও তার

ন রোগের সঙ্গে যুঝতে হ'লেই টিকা

ই ভারা উচিত ছিল। এমন সবুজ,

কেউ পাততে পরত, ওদের উপর

এর পর থেকে। কিন্তু

শ প্রস্তুত হয়ে এসেই

রবিনে আগে?' বহু

'মেয়েও ঠিক করেছ?' প্রায় আর্তনাদের মত শোনায় ওঁর গলার আওয়াজ।

মাথা নীচু করে মণি উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, যতীনের বোনকেই আমি বিয়ে করতে চাই!'

'আমি যদি মত না দিই?'

'তা হ'লেও আমাকে বিয়ে করতে হবে।'

আশ্চর্য রকম শান্ত শোনায় দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর, 'তাহ'লে ও মত জিজ্ঞাসার দরকার কি ছিল? সবই যখন স্থির করেছ, তখন মতটা নেবার অভিনয় কেন? আমার কাছে সেদিন মিথ্যাচরণেরই বা কি প্রয়োজন ছিল?'

'আপনার মনে ব্যথা দিতে চাই না বলেই মত নিতে আসা। আর আপনার অমতেরও ত কোন কারণ নেই, ওরা আমাদের পালটি ঘর।'

'ঐ মেয়েটিতে আমার আপত্তি, খোকা।'

'আমি কাকে নিয়ে জীবনে সুখী হবো, সেটা আমারই ত বোঝবার কথা বাবা। আপনি আমার সুখ চান, না নিজের জেদ বজায় রাখতে চান?'

'তোমার সুখ চাই বলেই ঐ মেয়েতে আমার আপত্তি। তোমার চেয়ে জগৎ ঢের বেশী চিনেছি, বয়স এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই আমার বেশী। তাছাড়া ও যে প্রায় তোমার সমবয়সী।'

মণির মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। সে বললে, 'মিছে কথা। যতীন আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড। ও তার ছোট বোন।'

'যতীন ক্লাসফ্রেণ্ড হ'লেও তোর চেয়ে বয়সে বড়।'

'সে যাই হোক বাবা, ওকে না পেলে আমার জীবনেরই আর কোন অর্থ থাকবে না।'

জীবনের অর্থ! ম্লান একটা বিদ্রূপের হাসি মুখে ফুটে ওঠে তাঁর। জীবন অনেক বড়, এমন বহু নারী জীবন থেকে সরে গেলেও জীবনের অর্থ যেমন তেমনিই থাকবে। কিন্তু তিনি মুখে বললেন, 'আমি মত না দিলেও তুমি বিয়ে করবে জানি, কিন্তু তারা কি বিয়ে দেবে?'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মণি উত্তর দিলে, 'তারা তোমার পয়সা দেখে বিয়ে দিচ্ছে না, আমাকে দেখে দিচ্ছে। তুমি পয়সা না দিলেও স্ত্রীকে আমি খাওয়াতে পারবো।'

এই প্রথম ধৈর্যচ্যুতি ঘটল দেবেন্দ্রনাথের। বললেন, 'বেশ তাই খাইও।'

মণিও সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সব সংযমের বাঁধ ভেঙে, মর্যাদা নষ্ট হবার আশঙ্কা ভুলে আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন দেবেন্দ্রনাথ, 'ভুল করিসনে খোকা, আমার কথা শোন—ও মেয়েটা ভাল নয়। ওর জন্য নিজের সর্বনাশ করিসনে। এখনও ফেরবার সময় আছে।'

'আর ফেরা যায় না বাবা। আমার সম্মানের প্রশ্ন আছে।'

মণি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে বাড়ি থেকেও।

অনেক ভেবে দেখলেন তিনি। সমস্ত দিন ধরেই ভাবলেন।

হয়ত খোকার কথাই ঠিক। তিনি বিষয় থেকে বঞ্চিত করবেন জানলেও তারা বিয়ে দেবে। কারণ তারা জানে যে একমাত্র মাতৃহারা সন্তানের ওপর রাগ করে আর কতদিন থাকবেন তিনি? একেবারে তার দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

আর সত্যিই, ছেলের ওপর প্রতিশোধ তিনি নেবেন না কিছুতেই। এতদিনের সমস্ত স্নেহ সে অনায়াসে ছেঁড়া জুতার মত ফেলে দিয়ে

চলে গেল, তাই বলে তিনিও ফেলে দেবেন? তাঁর স্নেহে ত খাদ ছিল না।

কিন্তু তা বলে এ যন্ত্রণাও আর না।

তিনি বালিগঞ্জে ওদের জন্য ছোট বাড়ি কিনে দিয়েছেন। ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা জমা করে দিয়েছেন মণির নামে। বলে দিয়েছেন যে, সে যদি ওঁর ব্যবসায়ে বেরোয় আর খাটে ত বেতন পাবে। হয়ত একটু বেশীই পাবে যোগ্যতার চেয়ে। কিন্তু আর কোন দাবী থাকবে না তাঁর ওপর—অন্য কোন সম্পর্কও না।

আজই তিনি সব বন্দোবস্ত শেষ করে দিয়েছেন। কাল বিবাহ হয়ে গেছে—ওরা ও বাড়িতে চলে গেছে এতক্ষণ। তিনি যাননি, যাবেনও না।

লোকে নিন্দা করবে? বলবে, পুত্রের স্নেহের চেয়ে জেদই বড় হ'ল তাঁর?

করুক। তিনি জানেন যে বরং আরও কঠিন হ'তে পারলে হয়ত সত্যিই ছেলের ভুল ভাঙতো। সারাজীবনের জন্য এত বড় ভুল করতে তিনিই পরোক্ষভাবে সাহায্য করলেন হয়ত।

কিন্তু আজ আর কোন কথাতেই তাঁর প্রয়োজন নেই।

তিনি আজ একা। আজ তিনি শান্ত। চিন্তা, ভাবনা, উদ্বেগ সব ঘুচেছে। আজ আর তাঁর চেয়ে সুখী কে?

তিনি আবারও হেসে উঠলেন। সে হাসি নির্জন ঘরগুলোয় প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

চোর! চোর!

অকস্মাৎ কোলাহলের একটা তপ্ত শলাকা যেন গলিটার শান্ত স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে চলে গেল—এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। আর্ত কোলাহল একটা।—সমবেত অনেকগুলো লোকের দ্রুত পদশব্দ, তার পর চোখের পলক ফেলবার আগেই সেটা গলির অপর প্রান্তে বড়রাস্তার দিকে বেরিয়ে চলে গেল।

'চোর! চোর!' 'ধর ধর' 'এই পাকড়ো—পাকড়ো' 'মশাই ল্যাং মারুন না!' এমনি টুকরো টুকরো দু একটা কথা কোলাহলের অস্পষ্টতার মধ্যে থেকে অতি কষ্টে উদ্ধার করা গেল।

দেখতে দেখতে দু পাশের দোকান থেকে সবাই বেরিয়ে পড়ল। জনতা যেন নিমেষে নিমেষে বহুগুণ হয়ে যাচ্ছে। আমরাও কৌতূহল দমন করতে না পেরে রাস্তায় নেমে পড়লুম। ব্যাপারটা কি? কি চুরি গেছে? কার চুরি গেছে?

ঐ ত! কোথায় পালাবে? এই সন্ধ্যা সাতটার সময়, চারটে রাস্তার মোড় থেকে পালান কি এতই সহজ! ধরা পড়েছে। শেষ অবধি একটা ট্রাম এসে পড়ায় নাকি লোকটাকে ধরা সম্ভব হয়েছিল, নইলে ছুটতে পারে সে অসাধারণ। তাও ট্রাম আসাতে সে ট্রামেই ওঠবার চেষ্টা করেছিল, তবে ঐ যে এক মুহূর্তের বাধা, তাতেই তার হিসাবটা বোধ হয় গোলমাল হয়ে গেল। আর তা ছাড়া আমাদের অনিলও খুব চতুর, এটা মানতেই হবে—নইলে সেই সামান্য সূক্ষ্ম বাধাটুকুতে যে সময়টা পাওয়া গিয়েছিল তার ভেতরেই ওকে ধরে ফেলতে পারত না।

বাস্তবিক, অনিল যেন এ পাড়াটার অভিভাবক দেবতা। ঠিক

মোড়টিতে সে ঠেলাগাড়ি করে মনোহারী জিনিষ সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে। নিজে ব্যবসা করে, কিন্তু ওর নজর থাকে সর্বত্র। এই অল্প ক-দিনের মধ্যে কত চোরই ধরলে সে। এ পাড়ায় পকেট-কাটা বা ছিঁচকে চোর এলে আর অব্যাহতি নেই। অনিল তাকে ধরবেই।

মন্দ লোক বলে অনিল নিজেও নাকি প্রথম বয়সে নাম-করা গুণ্ডা ছিল কিন্তু এখন সে সব ছেড়ে দিয়েছে। তবে সেই অভ্যাসটার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপই বোধ হয়, ও যেন চোর বা গুণ্ডাদের প্রতি বেশী মাত্রায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ওর চোখে ধরাও পড়ে সেই জন্য সহজে। সে যাই হোক্ আমরা ওর হুঁশিয়ারীর জন্য যে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি, এটাই আমাদের কাছে বড় কথা। ও দীর্ঘজীবী হোক্ আর এমনিভাবে আমাদের পাহারা দিতে থাক্, এটাই আমরা চাই।

আমরা ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে ততক্ষণে লোকটির চারিদিকে জনতার একটি চক্র তৈরি হয়ে গেছে বেশ ঘন। কীল চড় লাথি যার যা খুশী অজস্র মেরে নিচ্ছে। সে যেন প্রহারের বর্ষণ। তার ভেতর থেকে লোকটাকে ভাল করে দেখাই যায় না। শুধু আর্তনাদ কানে আসছে, মর্মান্তিক আর্তনাদ, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গোঙাতে গোঙাতে বল্‌ছে লোকটা, 'ও বাবু আমাকে ছেড়ে দেন, ও বাবু আমার কথা শোনেন। ও বাবু আমি চুরি করিনি—'

'চুরি করনি! আবার চালাকি! আবার মিছে কথা!'

এটা অনিলের গলা, চিনতে পারলাম। প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি করে চড়। অনিলের কেঠো হাতের চড়ে শুনেছি কাবুলি-ওয়ালারাও অজ্ঞান হয়।

অতিকষ্টে লোকটিকে দেখতে পেলুম—যারা মারছেন তাদের প্রায় দ্বিগুণ বয়সের। মধ্যবয়সী একটি লোক, গায়ে গেঞ্জি খালি পা। মাথায়

টাক্ আছে, দাঁড়ি গোঁফ মধ্যে মধ্যে কামান অভ্যাস আছে—এখন খোঁচা খোঁচা হয়ে রয়েছে। মারের চোটেই বোধ হয়, গেঞ্জিটার শতচ্ছিন্ন অবস্থা, ধুতিটাও কোথা যেন খসে পড়ে গিয়েছে; সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেহের বহুস্থান ইতিমধ্যেই ফুলে উঠেছে; কাটা ঠোঁট এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

একরকম জোর করেই থামিয়ে দেওয়া হল অনিলকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার কি চুরি করেছে? কলম, না মণিব্যাগ?'

ভবেশবাবু এইবার সমবেত জনতার মনোযোগ তাঁর দিকে ফেরালেন, 'আরে ভাই, নেবে কি? নেওয়া কি এতই সহজ? আমি ভবেশ ঘোষাল, সাতটি কাক মরে একটি ভবেশ জন্মেছি। তাইতেই ত ম'ল, গেছিস্ কি না আমার পকেট থেকে মণিব্যাগ তুলতে!

'ও, তুলতে পারেনি! তুলতে যাচ্ছিল এটা ঠিক দেখেছেন?'

'নয়ত কি মশাই, মিছে কথা বলছি?' ভবেশবাবু চটে উঠলেন।

উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে কে বলে উঠল, 'মণিব্যাগটা ওঁর নেবার চেষ্টা করেনি কি না, তাই উনি অত সিম্প্যাথেটিক্। নিজের দশ আঙুলে খাটা কড়ি নেবার চেষ্টা করলে বুঝতে পারতেন!'

চোরটা ইতিমধ্যে কোনমতে লোকের পায়ের তলা থেকে ধুতিটা উদ্ধার করে কোমরে জড়িয়েছে। সে আবারও মিনতি করে বলতে গেল 'বাবু আমি নিইনি, সত্যি কথা বলছি, হাতটা ঠেকে গেল তাই—'

'হাত ঠেকে গেল? আবার ন্যাকামি হচ্ছে!'

পুনরায় প্রচণ্ড একটি চড়। বলা বাহুল্য অনিলেরই।

কিন্তু সমস্ত প্রহারগুলো অনিল একচেটে করবে, ভীড়ের অনেকেই সেটা পছন্দ করলে না। ওধার থেকে বইয়ের দোকানের সলিল এবং ডাক্তারখানার রমেশবাবু এগিয়ে এসে যথাক্রমে রদ্দা ও ঘুঁষি বর্ষণ শুরু করলেন। লোকটা এইবার বসে পড়ল।

হয়ত আমরা ঠিক থামাতে পারতুম না কিন্তু চোরটার সৌভাগ্যক্রমেই বোধ হয়, কখন পদ্মরাজ সরকার তাঁর দামী নতুন হাম্বার গাড়ীখানা থামিয়েছেন পেছনে এসে, আমরা টের পাইনি। তাঁর ভারি গলাটা শোনা গেল, 'কি হয়েছে কি, এখানে এত গোলমাল কিসের ?'

পদ্মরাজ একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এ ছাড়া কটনমিল, চা বাগান, বিস্কুটের কারখানা এমনি নানাবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন। প্রচণ্ড বড়লোক বলে সবাই তাঁকে সমীহ করে। তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে। তিনি সব শুনে বললেন, 'লোকটাকে ত লোফার বলেই মনে হচ্ছে। আশ্চর্য নয়—চুরি করার চেষ্টা করেছিল হয়ত ঠিকই। বাট্ সরি, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড্স্, আইন আপনারা নিজে হাতে নিতে পারেন-না। ওকে পুলিশে দিতে পারতেন আপনারা, আর দেওয়াই উচিত ছিল। এভাবে ওকে মারধর করাটা ঠিক হয়নি। এখন ও যদি পুলিশে যায় ? কি প্রমাণ আছে আপনাদের যে ও চুরি করতে গিয়েছিল ? কিন্তু ওকে যে আপনারা মেরেছেন তার হাজারো সাক্ষী এখানে আছে।'

সবাই যেন একটু ঘাব্‌ড়ে গেল কথাটায়। কিন্তু সাতটি 'কাকের রূপান্তরিত মূর্তি ভবেশবাবু তাঁর ক্ষীণকণ্ঠে একবার বলবার চেষ্টা করলেন, 'আমি মশাই নিজে স্বচক্ষে ফীল করলাম, আমার ব্যাগে ওর হাতটা ঠেকল—'

'ওয়েল, ওয়েল, দ্যাট ইজ নো এভিডেন্স্। আপনি ফীল করলেন, তা আবার স্বচক্ষে! ও কথাটা আদালতে টিকবে না।...দেখুন, সে আপনাদের 'কনসার্ন'—পুলিশে দিতে চান নিয়ে যান, আমার, কিন্তু আস্ক ‌ থিঙ্ক্ এ লিট্‌ল্—কনসিকোয়েন্স্‌টা ভেবে দেখবেন।

ভবেশবাবুর কণ্ঠস্বর এবার রীতিমত ক্ষীণ হয়ে এল, 'আমি মশাই আপিস থেকে বাড়ী ফিরছি, একগাদা বাজারপত্র সঙ্গে, আমি এখন থানায় যাবো কি করে ?'

রমেশ সলিলের দল ইতিমধ্যে ভোজবাজীর মতই নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেছে। অনিল একা পড়ে যায় দেখে মৌখিক তম্বীটা বজায় রেখে বললে, 'ও পুলিশে টুলিশে আর দিতে হবে না। আমার হাতই পুলিশ। পুলিশ ফুলিশের আমি ধার ধারি না।...যা মার ওকে দিয়েছি ঐ ওর ছমাস মনে থাকবে। এই শোন্, কান মল, ভাল করে—আর কখনও করবিনা ত ?...আচ্ছা যা। মনে থাকে যেন ?'

চোরটা ছাড়া পেয়ে অতিকষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। বোধ হয় পায়েও লেগেছে খুব। হয়ত কেউ লাথি মেরেছে জুতোসুদ্ধ, কিম্বা লাঠি। কে জানে! দেখতে দেখতে জনতাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যারা পেছনে ছিল, মারতে পারলে না তাদের কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে গেল, 'উঃ, চোরকে মারবে, তার আবার অত আইনকানুন। উনি বড়লোক কি না, আইনকানুন দেখিয়ে গেলেন খুব—'

আমরাও যে যার স্বস্থানে ফিরে এসে বসলুম। গলির জীবনস্রোত পনেরো মিনিট আগেও যেমন মন্থর গতিতে বইছিল, তেমনি বইতে লাগল।

বসে বসে ভাবতে লাগলুম ঘটনাটার কথা। মনে মনে এটাকে কেন্দ্র করে কত কি গল্প রচিত হতে লাগল। কল্পনায় দেখলুম, ভবেশবাবু এতক্ষণে বাড়ী ফিরেছেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাঁ-ধারে একটা সরু গলির মধ্যে ওঁর বাড়ী। পথে যেতে যেতে ভদ্রলোক বাজারের থলি হাতে ক্রমেই যত লোককে পেয়েছেন গল্পটা শুনিয়েছেন। অল্প কে

কান লোক হলেই ব্যাগটা আজ যেত, শুধুনা কি চোরটা না জেনে অমন ঘাবালের পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করাতেই এই বিপত্তি! ফলে বাড়ী ফিরতে যথেষ্ট রাত হয়েছে, স্ত্রী উদ্বিগ্নমুখে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, হ্যাগা, আজ এত রাত?'

'আর বলো কেন?' সোৎসাহে ভবেশবাবু বলেন, 'পথে একব্যাটা চোর যে পকেট মারছিল গো!'

'তারপর? গ্যালো?' স্ত্রীর কণ্ঠে প্রায় হতাশা।

'হুঁ! যাবে বল্লেই যাবে কি না! বাছাধন যেকার সঙ্গে চালাকি করতে গিয়েছিলেন তাত জানেন না! ধরে ফেললুম। তারপর সবাই মিলে দে মার দে মার ব্যাটাকে। খুব উত্তম মধ্যম দেওয়া হলো খানিক।.... তাইতেই ত দেরি হয়ে গেল!'

'তারপর? পুলিশে দিলে লোকটাকে?'

'ন্-না। অনেকে বলেছিল বটে। তা আমি দেখলুম যা দেওয়া হল, এখন তিন হপ্তা ওকে বিছানায় শুয়ে ঝোলভাত খেতে হবে। আমিই বললুম ছেড়ে দিতে—'

ইতিমধ্যে মেয়ে নন্দিতা হাত থেকে বাজারের থলিটা নিয়ে নামিয়ে রাখল। উঁকি মেরে থলিটা একবার দেখে নিয়ে বললে, 'কৈ বাবা আমার খাতা আননি?'

'হচ্ছে হচ্ছে,' ভবেশবাবু উবু হয়ে বসে থলে থেকে জিনিষগুলো একে একে নামিয়ে রাখতে থাকেন। পুঁইশাক, এক ফালি কুমড়ো, এক তাড়া মুলো, চারটি উচ্ছে, একখানা কাপড় কাচা সাবান, ছুমুক— তার নীচে থেকে বাঁধানো লাল রুলটানা কাগজের প্যাড, চারটি বাদামী কাগজ—তার এক পিঠে কি সব ছাপা, দুটো নতুন পেন্সিল, কাগজে মোড়া গোটাবতক নিব, খানিকটা ব্লটিং, একটা ইরেজার এবং

আধখানা মোটা লালনীল পেন্সিল। বড়ছেলে বন্ধু ছোট মেয়ে লালনীল পেন্সিলটা কেড়ে নিলে। ফটিক ভাল ছেলে, এবারেও সেকেণ্ড হয়েছে, ভবেশবাবু তাকে ডেকে সস্নেহে একটি গোটা পেন্সিল ও নিব গুলো দিয়ে দিলেন। নন্দিতা নাকি সুরে বললে 'কৈ খাতা—ওঁ ওঁ ওঁদের পেন্সিল—'

'এই ত এই কাগজগুলো আনলুম কি করতে? কাল সকালে একটা খাতা বেঁধে দেবো—রাফ খাতা করবে তার আবার—'

'হ্যাঁ, তাই বৈকি! অফিসের ছাপা কাগজ, মেয়েরা কত ঠাট্টা করে আমাকে।'

'যা যা। ভারি নবাবের বেটি নবাব হয়েছে। অফিসের কাগজ চলবেনা, ওঁকে নতুন খাতা কিনে দিতে হবে। কে না আনে অফিসের খাতা তাই শুনি। আমরাও ঐ সবে লেখাপড়া করেছি। পেন্সিল কাগজ কোনদিন কিনতে হয়নি।......আচ্ছা না হয় ঐ প্যাড্‌খানা থেকেই একটা ভাল খাতা করে দেব, যা!'

'এবার তোমার এসব পেতে এত দেরী—?' গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

'আর বলো কেন? নতুন এক শালা ছোট সাহেব এসেছে, মাসে একবার করে দেবে এই নিয়ম হয়েছে এবার—'

সলিলেরও সেদিন বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হল। দোকানের ওপর তলায় একটা ঘরে ওদের গুদোম। সলিল সব সেরে ওপরে চাবি দিয়ে আসে। সেদিনও যথারীতি চাবি দিতে গেল। অনেকগুলো ঘর ওপরে, প্রত্যেকটাই হয় কোন দোকান, নয়ত দোকানের গুদাম। তখন প্রায় সবগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। ওপরের বারান্দাটা রীতিমত

অন্ধকার। সলিল কোনমতে হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে চাবি খুলে ফেললে। গুদোম ঘরের জানালাটা ঠিক মত বন্ধ আছে কি না দেখে আবার চাবি দেবে, এবারে সবগুলো তালা, এই ওর তখনকার কাজ। এটা নিত্যনৈমিত্তিক।

সলিল জানালা বন্ধ করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলে। তারপর অভ্যস্ত দ্রুত-হস্তে খানদুই বই বার করে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে বারান্দার এক কোণে জড়-করা জঞ্জালের মধ্যে বই দুটো লুকিয়ে রেখে দোর বন্ধ করে একে একে সেই ছ'-সাতটা তালা বন্ধ করলে। সেগুলোকে সশব্দে জোর করে টেনে টেনে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে নেমে গিয়ে দারোয়ানের হাতে চাবিটা দিলে, তখন প্রায় দশ মিনিট ধরে নিচের দোকান বন্ধ হল। বাবু গিয়ে উঠলেন নিজের গাড়ীতে, বেয়ারা, দারোয়ান এবং অন্যান্য বাবুরা যে যার নিজের নিজের বাসার পথ ধরলে।

সলিলও ট্রাম রাস্তা ধরে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কি যেন মনে পড়ল ওর, বোধ হয় কি একটা ভুলেছে। সে আবার সমস্ত পথটা ফিরে এল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে সে দোকানের বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তখন সব দোকানই বন্ধ হয়ে এসেছে—গলিটা অন্ধকার এবং জনবিরল। তবু বেরিয়ে আসবার সময় সলিল দোরের আড়াল থেকে রাস্তাটা একবার ভাল করে দেখে নিলে কেউ চেনা লোক আসছে কি না—তারপর দ্রুতবেগে গিয়ে ঢুকল ওধারে একমাত্র যে বইয়ের দোকানের দরজাটা ছ ইঞ্চি খোলা ছিল তখনও, এবং তার ভেতরে আলো জ্বলছিল—সেই দোকানে। 'এত দেরি?' কে যেন প্রশ্ন করলেন।

'এই যে, হেঁ-হেঁ করে খানিকটা দেরি হয়ে গেল। ওকি, মোটে তিন টাকা দিলেন? না হয় ত্রিশ টাকাই ধরুন কমিশন।'

'হ্যাঁ, চোরাই মালে আবার কমিশন। আধা-আধি ধরেছি। আমাদেরই কি রিস্‌ক্ কম ?' সলিল বিমর্ষমুখে বেরিয়ে এল। ওর আরও টাকার দরকার ছিল।

রমেশবাবু বাড়ী ফিরতেই তাঁর ছোট ভাই এসে বললে, 'দাদা মহেশ ডাক্তার ইঞ্জেকশনটার জন্য তিনবার লোক পাঠিয়েছে।'

'তা-ত পাঠিয়েছে। টাকা দিয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, ষোল টাকা।'

'কেন, ষোল টাকা কেন ? আমি বলে দিয়েছি না আঠারো টাকা নেব! বাজারে কোথাও বাইশ টাকার কমে পাবে না।....তুই যা, টাকা ওষুধ দুই-ই নিয়ে যা, যদি আর দুটাকা দেয় ত মাল দিবি, নইলে ফিরিয়ে আনবি। খদ্দেরের অভাব নেই আমার।'

ভাই মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'মহেশ-দা বলে তোর দাদার ত সবই লাভ, মিছিমিছি জুলুম করিস কেন ?'

'হ্যাঁ—জুলুম বৈকি। ও মক্কেলের কাছে ঐ ওষুধের অন্ততঃ ডবল দাম নেবে না ?'

পদ্মরাজ সরকার বাড়ী ফিরলেন রাত একটারও পর। স্ত্রী ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলেন।

'কি গো, ব্যাপার কি ? তোমার কি আর বাড়ী ফেরার কথা মনে থাকে না ?'

চাকর জুতো খুলে নিচ্ছিল পা থেকে। সে চলে যাবার পর পদ্মরাজ মুখ খুললেন, 'আমি যে কি মজায় রয়েছি, তা তুমি কি জানবে ? আমার আবার দিনরাত !'

সাবালক

'কেন গো, কি হল?'

'ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল তা ত জান—আজ হোক্ কাল হোক্ পেমেণ্ট বন্ধ করতে হবে। অথচ আমাকেও ত খেতে হবে? সম্বলের মধ্যে বোলপুরের ঐ জমিটা—ওটা ব্যাঙ্কেরই পয়সায় কেনা, তা সবাই জানে। পেমেণ্ট বন্ধ করলেই সবাই চেপে ধর্‌তো, তখন আর ও জমিতে হাত দেওয়া যেত না। তাই গোপনে সব বন্দোবস্ত করে জমিটা বেচে দিলুম। আজ সেই সব ফাইন্যাল হল। রেজেস্ট্রী অফিস থেকে বেরিয়ে চেক্ ভাঙ্গিয়ে লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে এলুম বাইরে, আমরাও কাল তুফানে রওনা হচ্ছি, দিল্লী হয়ে মুসৌরী। এখানের গোলমাল একটু না মিটলে আর ফিরতে পারব না। চেনাশোনা লোক ছিঁড়ে খাবে।...নাও দিকি, যতটা পারো আজ রাত্রেই গুছিয়ে নাও। সময় কম। আর ছাখো—ছেলেপুলেগুলোকে এসব কিছু বলে দরকার নেই—বলো যে এমনিই বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে—

সে চোরটিও ততক্ষণে বাড়ী ফিরেছে। ক্ষতবিক্ষত পিষ্টদেহ, পা টেনে টেনে চলতে কষ্ট হয়, তার ওপর বাড়ী সেই বেলেঘাটার এক প্রান্তে—বস্তি অঞ্চলে।

ওর নাম? ধরে নেওয়া যাক্—সতীশ।

ওর স্ত্রী বিমলাও জেগে অপেক্ষা করছিল, নরককুণ্ডের মত সেই বস্তির একটি অত্যন্ত পুরনো ঘরের কপাট ধরে। কাছে আসতেই ক্রত নেমে এল সে রাস্তায়, 'এত রাত কেন গো তোমার?...ওমা একি কাণ্ড?'

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে বিমলা। সাম্‌না-সাম্‌নি আসতে গ্যাসের আলোয় সে দেখতে পেয়েছে অবস্থাটা।

'কিছু নয়, চলো বলছি।'

সতীশ মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে ঘরের মেঝেতে এসে বসে পড়ল। বিমলা তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে কুপিটা ধরায়। তারপর আরো ভাল করে দেখে সে শিউরে ওঠে—'এ কি সর্বনাশ গো, এমন কাণ্ড কে করলে!'

কুপির সেই ক্ষীণ আলোতেই যেন ঘরের মধ্যেটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পেল। একটা ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের ওপর অত্যন্ত মলিন একটা কি বিছানার মত, মাটির দু-একটা রান্নার সরঞ্জাম—কতকগুলো শুক্‌নো পাতা, ছেঁড়া কাগজ এবং করাতের গুঁড়ো ইন্ধনের জন্য কুড়িয়ে এনে জড়ো করা একপাশে। আসবাব বলতে শুধু এই। বিমলার গায়ে ছেঁড়া ময়লা ট্যানার মত একটুকরো কাপড়।

বিমলা ততক্ষণে কেঁদে ফেলেছে। সতীশ কিছুক্ষণ ওর দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে থেকে বললে, 'একজনের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিলুম; ও তারই চিহ্ন—'

'পকেট মারতে গিয়ে!'

'হ্যাঁ। আজ তিন চারদিন ধরেই চেষ্টা করছি, অভ্যাস ত নেই—পারি না। তবে এতদিন সাহস করে কারুর পকেটে হাত দিইনি—তাই ধরাও পড়িনি। আজ দিতে গিয়ে—'

'তুমি—তুমি চুরি করবে?'

'চেষ্টা করব অন্তত। নইলে তুমি ত জান চাকরির চেষ্টা কম করিনি, দু-দুবার আনাজ ফিরি করতে গিয়ে সামান্য যা বাসন-কোসন ছিল তাও বিক্রী করলুম। ভিক্ষার চেষ্টাও দেখেছি কিন্তু ভিক্ষা কেউ দিতে চায় না। ক'দিন ভিক্ষা করে দেখ্‌লুম ত—চার পয়সা, ছ' পয়সা সারা দিনে। তিনদিন ত প্রায় উপোষ চলেছে। কি করব বলতে পারো?'

বিমলা সেই অত্যন্ত মলিন ট্যানানেই চোখ মুছে বললে, 'তুমি এত গরীব যে চুরিও করতে পারবে না। তার দরকারও নেই, আমি এক জায়গায় আজ কাজ পেয়েছি, ঝিয়ের কাজ—আমার খাওয়া পরা ছাড়া আট টাকা করে পাবো। রাত্রের ভাত নিয়ে বাড়ী চলে আসব—বলে কয়ে নিয়েছি।'

'তুমি ঝিয়ের কাজ করবে বিমলা!'

বিমলা ম্লান হাসল 'তুমি কোথায় নেমেছ আগে সেদিকে তাকিয়ে দ্যাখো!'

আশা

গোধুলিয়া গাড়ীর আড্ডার পিছনের গলির মধ্যে অন্ধকার সেকেলে বাড়ী। এমনিতেই অন্ধকার, আকাশের কোণে মেঘ দেখা দিলে আর রক্ষা থাকত না। মাস্টার মশাইরা বই বন্ধ করে ঢুলতেন, আমরা গোল হয়ে বসে মাথা নীচু করে গল্প করতুম চুপি চুপি। এমনি এক বাদলীর দিনে কথা হচ্ছিল, কে কী হবে ভবিষ্যতে বড় হয়ে।

কেউ বললে ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ বললে জজ—কেউ বললে নেতা। তা ছাড়া ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার কত কি। শুধু ফণী বললে, 'আমি ভাই ইস্কুল মাস্টারী করব!'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তখন ওদিককার বেসরকারী ইস্কুলে মাস্টার মশাইরা মাইনে পেতেন পনেরো, কুড়ি থেকে শুরু করে বড়জোর ষাট কিংবা আশি। আমাদের নিচের ক্লাশে যাঁরা পড়াতেন

তাঁদের অধিকাংশরই মাইনে কত আমরা জানতুম—পনেরো, আঠারো বাইশ।

আমাদের হাসিতে অপ্রতিভ হয়ে ফণী বললে, 'না ভাই, টাকার কথা ভেবে ঠিক বলিনি। ছেলেদের মানুষ করে তুলব, আমার দেশবাসী আমার হাতে মানুষ হয়ে উঠবে, ভাবতেও ভাল লাগে।"

কথাটা আমরা বুঝিনি। সেদিন মনে মনে ভেবেছিলুম, বেচারী ফণী, ওর আর দোষ কি! ওর যা অবস্থা তাতে পনেরো টাকা মাইনের মাস্টারীই ঢের। কাশীর বাঙ্গালীটোলার অন্ধকার এক গলির আরও অন্ধকার বাড়ীর নিচের তলায় বিনা ভাড়ায় থাকে ওরা। বাবা যজমানী করেন। খালি পায়ে উড়নী (বাবার দানে পাওয়া) গায়ে ও ইস্কুলে আসে—খায় এই ইস্কুলেরই পাশের ছত্রে। সবাই বাড়ী থেকে খাবা নিয়ে আসে; ওকে ইস্কুলে আসার পথে, নয়ত টিফিনের সময়, খেতে হয় বলে এক মুদির দোকানে মাসিক দু পয়সা বন্দোবস্ত করে রেখেছে, রোজ একখানা পাতা পায়। কোনদিন দৈবাৎ দোকান বন্ধ থাকলে উড়নি পেতে ভাত খেতে হয় বেচারীকে, পরে কেচে সেই ভিজে উড়নি গায়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অবশ্য তার জন্য ওকে লজ্জা পেতে হয়নি কখনও। তখন কাশীতে ভিখারীর ছেলের সঙ্গে লক্ষপতির ছেলে চার মাইল হেঁটে ইস্কুল যেত, একই সঙ্গে পরের গাছের পেয়ারা চুরি করত—শিবরাত্রির উপোস করে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াত। বড়লোকের ছেলের জন্য গাড়ী, কিংবা বাড়ী থেকে টিফিন এসে মনে করিয়ে দিত না যে, আমরা গরীব, ওদের সমান নই।

সুতরাং আমরা ফণীকে উপেক্ষা না করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে ইস্কুলমাস্টারী থেকে ওকালতিতে সুবিধা ঢের, টাকাও বেশী। ফণী বোঝেনি।

এরপর চলে আসি কলকাতায়। ছেলেবেলার বন্ধুরা সব কে কোথায় হারিয়ে গেল। একেবারে দশ বছর পরে কাশীর রাস্তায় হঠাৎ দেখা ফণীর সঙ্গে। ঠিক তেম্‌নি আছে ফণী, তেম্‌নি কালো এবং রোগা, ধনুকের মত বাঁকা ও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া চেহারা, খালি পা, গায়ে উড়ুনি।

'কী করছিস রে?' ফণীর উজ্জ্বল মুখে সংবাদ দিলে, 'সেই ইস্কুলেই পণ্ডিতি করছি। কুড়ি টাকা মাইনে। বেশ আছি।'

'বিয়েথা করেছিস?'

'করেছি বৈকি!' আনন্দে যেন ঝল্‌মল্‌ করছে ওর মুখ, বললে, 'ছেলেরা বেশ মান্য করে—দু-একটা ভাল ছাত্রও পেয়েছি।'

ওর নির্বুদ্ধিতায় দুঃখিত হলুম। ছোক্‌রা লেখাপড়ায় ভাল ছিল, ওকালতি করতে পারত। তা নয়, কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী! উপদেশ দিলুম অনেক, 'নিজের উন্নতির চেষ্টা দেখ্‌। পণ্ডিতি করে কী হবে?'

সে বললে, 'বুঝিস না—আমার না হয় দু পয়সা কম হ'ল কিন্তু তার দ্বারা যদি একটা ছেলেকেও মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি সে কি কম লাভ? আমার ত ভাই এই বেশ ভাল লাগে।'

আবার বছর দশেক আর কোন খবর রাখি না ওর, কাশী গেলেও দেখা হয় না। হঠাৎ সেবার পূজোর সময় ওর সঙ্গে দেখা গঙ্গার ঘাটে। এখনও ঠিক তেম্‌নি আছে, পায়ে জুতোর বালাই নেই, গায়ে সেই আদি ও অকৃত্রিম উড়ুনি। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু চুলের ধারে ধারে রূপোলি লাইন দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ পাক ধরেছে।

ফণী যেন আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে—এমন খুশী। বললে, 'আরও তিনটে সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়েছি রে—সঙ্গে সঙ্গে বি-এ

পরীক্ষাও। এখন বাংলা ইস্কুলের হেড্-পণ্ডিত। ষাট টাকা মাইনে হয়েছে। তোরা ত খুব আমাকে দমিয়ে দিয়েছিলি তখন!

বললুম, 'কিন্তু বেশভূষায় ত তোমার তেমন উন্নতি দেখাচ্ছ না। সে-ত যে কে সেই।'

ফণী একটু যেন লজ্জিতভাবে বললে, 'কী করব, একটা সখ ছিল অনেক দিনের—বাড়ীতে একটা টোল খুলেছি, সংস্কৃত পড়াবার জন্যে। তিন চারটি গরীব ছাত্র আছে, তাদের আবার খেতে দিতে হয় ত, ও আমি সেকালের অধ্যাপকদের মতই বিনা বেতনে পড়াব এই ইচ্ছে আছে। এখনকার বড়লোকগুলো যে তেমন নয়—কিছু যদি মাসিক সাহায্য পেতুম ত একশ'টি ছাত্রকে রেখে পড়াতুম। কী করব, সামান্য আয়, আবার নিজের ছেলেমেয়েও ত আছে ভাই, পেরে উঠি না।'

ওর উড়ুনিতে এক পয়সার শাক, আরও কী সব বাজার করে নিয়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরছে ফণী।—এমন আকাট বোকাকে কী বোঝাব বলুন দেখি? এমন পাগলও মানুষ হয়!

জ্যোতিষী

লম্বা একহারা চেহারা, খাঁড়ার মত নাক, প্রশস্ত; এমন কি, টাক বার করাও বলা চলে,—এমন উঁচু কপাল আর তার মধ্যে ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সবটা জড়িয়ে বরদাচরণ জ্যোতির্বিনোদ মশাইয়ের চেহারাটা সুশ্রী না হলেও অসাধারণ ছিল বৈকি! তেমনি কি তাঁর কণ্ঠস্বর! মক্কেলদের সঙ্গে কথা কইতে

কইতে যখন তাঁর চড়া এবং তীব্র কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়ত, তখন মনে হ'ত যেন তা একটা শান্ত, স্নিগ্ধ স্তব্ধতাকে কেটে কেটে নিজের প্রচণ্ডতার বেগে কোন্ সুদূরে পৌঁছে গেল নিমেষে। সুতরাং প্রথম যারা আসত তাঁর কাছে, তারা তাঁর চেহারা, চাহনি, বুদ্ধি ও কণ্ঠস্বরের এই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতায় অভিভূত হয়ে পড়ত। সে মোহের সঙ্গে ভয় মেশানো থাকলেও পরিণামে শ্রদ্ধারই সঞ্চার করত মনে মনে।

এই অসাধারণ এবং তীক্ষ্ণ হবারই চেষ্টা করেছেন তিনি আজীবন।

সে চেষ্টাকে তপস্যা বলাই উচিত।

প্রথমেই তিনি সাবধান করে দিতেন মক্কেলদের, 'ঐ যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে—একেবারে চাঁদ হাতে তুলে দেয়, আমি তাদের দলে নই। মিছে করে বানিয়ে বলতে পারব না যে, পরের সম্পত্তি হঠাৎ হাতে পড়বে কিম্বা অপুত্রকের ছেলে হবে। ওতে আমার ঘৃণা বোধ হয়।'

তারপর মুহূর্ত-কয়েক মাত্র থেমে, স্তম্ভিত মক্কেলকে একটুও সামলাবার অবকাশ না দিয়ে তিনি আবার বলে উঠতেন, 'বুঝেছেন? গোঁজামিল দিতে আমি পারব না। হাতে যদি খারাপ লেখা থাকে ত মুখের ওপরই বলে দেব। সেটা সইতে পারবেন? অপ্রিয় সত্য? তা যদি না পারেন, তবে সরে পড়ুন।'

তারপর বাকি সকলের দিকে ফিরে স্থির সুতীব্র কণ্ঠস্বরকে আরও চড়িয়ে বলতেন, 'সেই জ্যোতিষীর গল্প জানেন ত, একজনের হাত দেখে বলে দিয়েছিল যে, তোমার একটা বড় রকমের লাভ হবে আর সামান্য কিছু লোকসান। তারপর সে লোকটা কী লাভ হবে ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছে, পড়ে গেল এক খানায়। হাত বাড়িয়ে যেমন

নিজেকে সামলাতে যাবে, মুঠো করে ধরলে এক ব্যাঙ, এধারে পা'টি গেল ভেঙে। সে ত কোনমতে বাড়ি ফিরে এল, তারপর জ্যোতিষীকে ডেকে বলল, দৈবজ্ঞিঠাকুর, এ কি? লাভের মধ্যে ব্যাঙ, আর অপচয়ের মধ্যে পা'টা! এই কি আপনার মোটা লাভ আর সামান্য লোকসান?... জ্যোতিষী তখন তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তা কেন? খানায় যখন পড়েছ, তখন মাথাটাও তো ফাটতে পারত, তাহলে মারাই যেতে একেবারে। এ তবু পা ভেঙেছে, খুঁড়িয়ে চলতে পারবে অন্তত। জীবনটা যে বেঁচে গেল—এ কি কম লাভ?'

এই বলে প্রচণ্ডভাবে আর একবার হেসে উঠলেন।

সে হাসির সামনে বিহ্বল ভয়চকিত মক্কেলদের মাথা আপনিই নুয়ে আসত।

তারপর হয়ত খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই মক্কেলের শিথিল ও ঘর্মসিক্ত হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরতেন। মিনিট-খানেক ধারালো ছুরির মত তাঁর চোখের চাহনি সেই হতভাগ্যের কররেখার ওপর বুলিয়ে শুধু একবার বলতেন, 'হুঁ' কিম্বা একটা অস্পষ্ট এবং অস্ফুট শব্দ করতেন, তারপর হঠাৎ গম্ভীর মুখে বাঁ-হাতে পাশ থেকে লেন্সটা নিয়ে ভাল করে হাতখানা দেখতেন পুঙ্খানুপুঙ্খ করে। এ সবটাই তাঁর চিরন্তন অভ্যাস—বরং স্বভাব বলাই উচিত।

এটা প্রথমে তিনি হিসেব করেই করতেন, মক্কেলকে অভিভূত করবার জন্যই। এখন আর চেষ্টা করতে হয় না, অভ্যাস তার নিজের কাজ করে যায়। তিনি জানতেন যে, এই আকস্মিক গাম্ভীর্যে মক্কেলদের বুকের স্পন্দন প্রায় থেমে আসে। তার পরের নির্ঘাৎ কোন বাণীর জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত হয়।

এর পর হাতখানা নামিয়ে রেখে গম্ভীর স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মক্কেলের মুখের দিকে চেয়ে বলতেন, 'শুনবেন আপনার ভাগ্যের কথা? ঠিক ঠিক শুনতে চান?'

সম্মতি যে আসত, তা বলাই বাহুল্য। তখন তিনি গলা নামিয়ে বলতেন, 'আমার এমনি অদৃষ্ট, ভাল হাত কি একটাও আসে না। শনি বিরূপ আপনার ওপর—আমি কি করব বলুন! এই সামনের এক বছরের মধ্যে আপনার অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটবে, একান্ত প্রিয়-জনের মৃত্যু, অর্থনাশ, স্বাস্থ্যহানি। আর কত বলব বলুন!'

তারপরও যদি সেই মাটির-সঙ্গে-মিশে-যাওয়া মক্কেলের কথা কইবার মত কোন শক্তি থাকত, তবে সে অনুরোধ করত, 'তা এর কোন প্রতিকার নেই? গ্রহপূজা বা শান্তি স্বস্ত্যয়ন-টস্ত্যয়ন!'

আবার চড়া স্বরে বেজে উঠত বরদা জ্যোতিষীর গলা।

'না মশাই, ওসব কথা আমার কাছে বলবেন না। তাহলে যান ঐসব বুজরুকদের কাছে, যারা বোকা বুঝিয়ে আপনাকে আড়াই শ' টাকার নবগ্রহ কবচ গছাবে কিম্বা যজ্ঞ করার জন্যে দেড়শ' টাকার ফর্দ দেবে। ওটি আমার দ্বারা হবে না। কত হাজার মাইল দূরে থেকে যেসব গ্রহ এমন করে মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করছেন, যার সুস্পষ্ট নির্দেশ আপনার হাতের চামড়ায় আঁকা রয়েছে, তাঁদের হারিয়ে দেবেন কবচ পরে কিম্বা আগুনে একটু ভেজাল ঘি ঢেলে? অতই সহজ? আপনারা ত লেখাপড়া শিখেছেন, আপনাদের কমনসেন্‌স্‌ কি বলে?'

'তা হলে কি কোন উপায় নেই?' ভগ্ন, স্খলিত কণ্ঠস্বরে নিরুপায়ের ক্লান্ত কাতরোক্তি ফুটে ওঠে।

'ঈশ্বরকে ডাকুন। যদি দীক্ষা হয়ে থাকে ত ইষ্টদেবকে ধ্যান ক'রে প্রত্যহ এক মনে দশহাজার কিংবা লক্ষ নাম জপ করুন।

জপাৎ সিদ্ধ, জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎসিদ্ধির্ন সংশয়! ···দীক্ষা না হ'য়ে থাকলে তাঁর যে নাম আপনার প্রিয় মনে হয় সেই নাম জপ ক'রে যান। জপতে জপতে ইচ্ছাশক্তি জাগবে—একমাত্র সেই ইচ্ছাশক্তি বা পুরুষকারই দৈবকে লঙ্ঘন করতে পারে। হয় বৈকি, কত স্বল্পায়ু লোককে দীর্ঘদিন বাঁচতে দেখলুম। নিজের কর্মফলে দৈবকেও প্রতিহত করা যায়!'

কিন্তু এ ব্যবস্থায় অধিকাংশ মক্কেলেরই মন উঠত না। অনেকেই বুঝত না এসব কথা। কোনমতে ওঁর দক্ষিণাটা দিয়ে সরে পড়ত। তাদের সেই অপস্রয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে বরদার কণ্ঠস্বর আবার তীক্ষ্ণ হাসিতে চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলত। তিনি বাকী সকলকে শুনিয়ে বলতেন, 'চলল আহাম্মুকটা ছুটে—এখনই কোন বুজরুক্কে দু'শ আড়াইশ টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত ওর শান্তি নেই।'

দু'একজন, যারা ওঁর অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ তাঁরা হয়ত বলতেন, 'তা আপনি জেনেশুনে এ টাকাটা হাতছাড়া করলেন কেন? ওরা যখন খরচ করবেই—'

'না, না,' যেন শিউরে উঠে বলতেন জ্যোতিষী, 'ওতে আমার সত্যিই ঘৃণাবোধ হয়। জানি যা দুর্লঙ্ঘ্য, যা কিছুতে নিবারণ করতে পারব না—তার জন্য হাত পেতে টাকা নেব, প্রবঞ্চনা ক'রে—সে আমার সইবে না।...তা ছাড়া ভগবানের ইচ্ছেয় আমার ত এক রকম চলে যাচ্ছে।' এখানে তাঁর কণ্ঠস্বরে আবার বিদ্রূপের আভাস জাগত, 'মজা হচ্ছে এই—যেখানে যত বুজরুকের কাছেই যাক্ একবার করে আমার কাছেও আসবে ঠিক, জানে যে এখানে সত্যি কথা পাবে। যা কিছু অমঙ্গল, যা কিছু আশঙ্কার, যা কিছু ভয়াবহ—ওরা জানে যে আমার চোখে পড়বেই ঠিক!'

বলতে বলতে তাঁর উজ্জ্বল চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত—অজানা কী একটা উত্তেজনায় যেন হাঁপাতে থাকতেন। তারপর হয়ত উঠে খড়ম পায়ে দিয়ে সংকীর্ণ-পরিসর ঘরের মেজেতে পায়চারি শুরু করতেন—সে সময় তাঁর চোখ দুটো হয়ে উঠ্‌ত লাল। খানিকটা পরে কেমন যেন চাপা হিংস্র গলায় বলে উঠতেন, 'জানি, অথচ প্রতিকার করতে পারি না—দেখতে পাই, তবু ঠেকাতে পারি না, এই জন্যই ত ওকে বলে নিয়তি! —তার চেয়ে অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট থাকাই বোধ হয় ভাল ছিল!'

যারা তাঁর পরিচিত, তাঁরা ওঁর এই ভাবটা জানতেন, আর বোধ হয় কারণটাও—তাই আর [illegible] করতেন না, কথাটা চেপে যেতেন।

হ্যাঁ কারণটাও অনেকেই জানতেন বৈ কি।

বরদা জ্যোতিষীর ইতিহাস এ অঞ্চলে অনেকেই জানেন।

জ্যোতিষী উনি ছিলেন না—প্রথম বয়সে বি-এ ফেল ক'রে এক ইস্কুলে ঢুকেছিলেন অঙ্কের মাস্টার হয়ে। ছোট সংসার, মা আর ছেলে—ছোট্ট একটু বাড়ীও ছিল মাথা গোঁজবার মত—তাই অভাব হয়নি, পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে সংসার চালিয়েও অনেক সখ মেটাতে পারতেন। এই সব সখের মধ্যে প্রধান ছিল পুরানো বই কেনা। বেশী দামের পুরানো বই কেনা সম্ভব নয় তাই সারা বিকেল আর সন্ধ্যেটা ঘুরতেন পুরানো বইয়ের বাজারে, হাঁটকে হাঁটকে একটা দুটো ছেঁড়া জীর্ণ কীটদষ্ট বই সংগ্রহ করে আনতেন। নিরীহ রোগা চেহারার এই ছোকরাটিকে বইওয়ালারা কৃপার দৃষ্টিতেই দেখ্‌ত তাই তারা সারাক্ষণ ধরে বই ঘাঁটলেও কিছু বলত না। তা ছাড়া

লোকটি কিন্তেন যত বাজে আর অকেজো বই (তাদের মতে)—তাই তারা সস্তা করেও দিত অনেক সময়ে। মা অনুযোগ করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা তামাসা করত কিন্তু এ নেশা তাঁর কাটত না কিছুতেই—বিয়ে-থা করে সংসারী হওয়া কিংবা আর একবার চেষ্টা করে বি-এ পাস করার সম্ভাবনা হয়ে পড়তে লাগল সুদূরপরাহত।

এমনি করে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতেই হঠাৎ বরদা পেয়ে যান খান-দুই ফলিত জ্যোতিষের বই—প্রাচীন পুঁথি, খবর নিয়ে জানলেন যে, এই বই দুটি খুব বিখ্যাত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য। পুঁথির আকারে ছিল বই দু'খানা, বিবর্ণ নাগরী লিপিতে ছাপা—একেবারেই বাজে বই মনে করে দোকানদার মাত্র আনা ছয়েক পয়সাতে বই দু'খানা দিয়েছিল।

ব্যস্, এইবার লাগল তাঁর এক নতুন নেশা। প্রায় গলে-যাওয়া পুঁথির পাতা থেকে, অতিকষ্টে উদ্ধার ক'রে ক'রে তিনি লিপিগুলো আর একটা খাতায় নকল করলেন। অর্থ বোঝবার অসুবিধা হচ্ছে দেখে আবার সংস্কৃত পড়তে শুরু করলেন নতুন করে। নতুন করে ব্যাকরণ ও অভিধান খুলে বসলেন। যেমন ক'রে হোক্ এর পাঠ উদ্ধার করতে হবেই—এর সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করা চাই-ই!

ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেও ফেললেন সবটা। এ যেন একটা নতুন দৃষ্টি খুলে গেল ওঁর। পুঁথির শ্লোকের বর্ণনার সঙ্গে নিজের ও মায়ের কররেখা মিলিয়ে মিলিয়ে চিন্তে শিখলেন, কোন্ রেখার কি অমোঘ নির্দেশ তাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন।

কিন্তু তবু ঠিক বিশ্বাস হয়নি। ছেলেবেলা থেকে অনেককে তিনিও হাত দেখিয়েছেন। তার কোনটা মিলেছে, কোনটা মেলেনি। ওঁর বিশ্বাস ছিল এগুলো অন্ধবিত্তর আঁধারেই ঢিল ছোড়া-হয়—যেটা

লাগে দৈবাৎ। কিন্তু এবার শুরু করলেন নিজেই বন্ধুবান্ধবদের হাত দেখতে। একে একে বহুলোকের হাত দেখলেন তিনি, বিনা পয়সায় সেধে-সেধেই। আর সেই তাঁর প্রথম চমক্ লাগল। জ্যোতিষশাস্ত্র এমন শক্তিশালী—হিসাব এমন নির্ভুল তার! যা বলেন তাই যেন মিলে যায়, দৈববাণীর মত তাঁর কররেখা-বিচার সত্য হয়, যেন নির্ভুল অঙ্কের মত হিসাব-করা সব ব্যাপারটা।

ফলে নেশা আরও বাড়ল। এদিক ওদিক খুঁজে আরও দু' একটা বই বার করলেন। ছুটলেন কাশীতে—গুধুড়ি বাজার থেকে পুরোনো জ্যোতিষের বই সংগ্রহ করলেন, লুধিয়ানাতে গেলেন মাসিক শতকরা দু'টাকা সুদে টাকা ধার করে। সেখানে কোন্ পাঞ্জাবী জ্যোতিষীর কাছে ভৃগুসংহিতার সম্পূর্ণ পুঁথি আছে, তাই দেখবার জন্য। দু'শোটি টাকা প্রণামী দিয়ে তবে তা একবার নাড়াচাড়া করবার অধিকার পেয়েছিলেন।

এইসব করার ফলে ইস্কুলের চাক্‌রীও বোঁটা শুকিয়ে খসে পড়বার মত হয়েছিল, তিনি নিজেই এবার সে সামান্য যোগসূত্রটি ছিঁড়ে দিলেন। এই বাড়িরই বাইরে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে গেলেন পেশাদারী জ্যোতিষীরূপে। নবদ্বীপে পাঁচটি টাকা দিয়ে জ্যোতির্বিনোদ উপাধি তাঁর আগেই আনানো ছিল।

কিন্তু সখ করে হাত দেখানো এক জিনিস আর টাকা খরচ করে দেখানো আর এক। যে সব বন্ধুবান্ধবরা এতদিন উৎসাহসহকারে ঘিরে থাকত তারা সরে পড়ল। তা ছাড়া তাদের কাজ ত হয়েই গিয়েছিল। এখন মক্কেল আর আসে না। দিনের পর দিন কাটে —রাত্রির পর রাত্রি। পাশে লেন্সখানা রেখে টেবিল ল্যাম্পের

আলোতে ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত বরদা জ্যোতিষী পড়াশুনে করেন। সে পড়াশুনোয় ব্যাঘাত ঘটে না একটুও। এখানে বাড়িটিং বাঁধা পড়ল। মা অনুযোগ ক'রে ক'রে হাল ছেড়ে দিলেন—'এ আবার কি সখ বাপু! যা হয় একটা চাকরী বাকরী দেখে নে মাথা গোঁজবার এ স্থানটুকুও গেলে দাঁড়াবি কোথায়?'

কিন্তু বরদা জ্যোতিষী তাঁর নিজের ভাগ্য তখন দেখে নিয়েছেন।

এই-ই তাঁর বৃত্তি। এই বৃত্তিতেই তাঁর জীবনধারণ করতে হবে অর্থ এবং যশও কিছু কিছু পারেন তিনি।

বহুদিন ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকার পর একটি দু'টি ক'রে মক্কেল আসতে লাগল।

ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার খাদ্যের ওপর, তেমনি করেই বরদা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরাই তাঁর বড়শীতে গাঁথা টোপ. যেমন ক'রে হোক্ এই টোপে মাছ ধরতে হবে।

ইতিমধ্যে বহু রাত্রি জেগে বরদা জ্যোতিষের একটা বিশে দিক আয়ত্ত করেছিলেন ইচ্ছে করেই। মিছে ক'রে ভাল ভাল কথ সাজিয়ে সাজিয়ে বলে আর পাঁচজন জ্যোতিষী যেমন ক'রে হাত দেখে, তেমন ক'রে দেখতে গেলে পসার জমাতে বহু বিলম্ব— বুদ্ধিমান বরদা তা বুঝেছিলেন। তিনি সে চেষ্টা করেননি। তিনি বিশেষ ক'রে চিনতে শিখেছিলেন দুর্ভাগ্যের রেখাগুলি—জন্মকুণ্ডলীর অমঙ্গলকর অবস্থানগুলির অব্যর্থ ফলাফল আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন অধিকাংশ হাতেই ভালর চেয়ে খারাপ বেশি। খারাপ ফলই সত্য হয় এবং এগুলো অন্য জ্যোতিষী বলে না। তিনি এই অস্ত্রে মক্কেলদের ধরাশায়ী করবেন— অমঙ্গলের মন্ত্রে নিজের মঙ্গল ডেকে আনবেন!

তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অভ্যাগতদের বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসতে লাগল —তীক্ষ্ণতর কণ্ঠের অশুভকারী ভবিষ্যৎ-বাণী কানের মধ্যে আগুনের মত জ্বলতে লাগল। কিন্তু তবু তারা আসতে লাগল। মক্কেলের সংখ্যা বাড়তেই লাগল দিন দিন। তার কারণ বরদার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। দৈবের মত অমোঘ, মৃত্যুর মত ধ্রুব। প্রত্যেক মানুষের মনে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে নিষ্ঠুর সত্য সম্বন্ধে। যাতে সে যন্ত্রণা পায়, তাই সেই আঘাত পেতেই বার বার এগিয়ে আসে। মুখে বলে, 'আগে জানতে পারলে তবু সাবধান হওয়া যায়—এ একরকম ভালই!' যদিচ কোন সতর্কতাই কাজে আসে না। বরদার ভবিষ্যৎবাণীকে কোন গ্রহযজ্ঞে বা কোন শান্তি-স্বস্ত্যয়নে এড়ানো যায় না। তবে নাকি মানুষ ঠিক নিজের অমঙ্গল বিশ্বাস করে না, আশা করে শেষ মুহূর্তে কোন না কোন উপায়ে সেটা খণ্ডিত হয়ে যাবে। তাই তারা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে না, কিংবা আত্মহত্যা করে না। কারণ বরদার দয়ামায়া নেই—কোন সাংঘাতিক কথাই তাঁর মুখে এড়ায় না। মায়ের মুখের ওপর তার একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর সম্ভাবনাটা তিনি অকম্পিত কণ্ঠেই শুনিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু অমঙ্গলটা নির্ভুলভাবে দেখা বরদা জ্যোতিষীর পেশা থেকে নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

তাই পরের কর-রেখার ফলাফলের সঙ্গে নিজেরটাও দেখে নিয়েছিলেন আগেই।

দু'টি সাংঘাতিক ফল। কঠিন, মৃত্যুঘাতী সে কথা।

কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করেছেন বরদা। কর-রেখায় বিশ্বাস হয়নি—জন্ম-কুণ্ডলী খুলে বসেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জন্ম সময়

সম্বন্ধে সংশয় হয়েছে, গণনা করে বার করেছেন নিজের জন্মতারিখ ও ঘণ্টা। ছুটে গিয়েছেন কাশীতে, গিয়েছেন কাশ্মীরে—ভৃগুসংহিতার সঙ্গে মিলিয়েছেন।

না, ভুল কোথাও নাই।

মাতৃঘাতী যোগ আছে তাঁর হাতে। আর আছে স্ত্রীর কুলত্যাগিনী হওয়ার সংবাদ। যখন কোনমতেই এটাকে উড়িয়ে দেওয়া গেল না—তখন তিনি মন স্থির করে ফেললেন। শাস্ত্রমতে যা সবচেয়ে কঠিন যজ্ঞ—তাই তিনি করবেন প্রথমটা•এড়াবার জন্যে। আর দ্বিতীয়টা খুব সোজা, তিনি বিয়েই করবেন না। ইতিমধ্যে বয়সও ত হয়ে গেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ, কি দরকার ও ঝামেলা জড়াবার?

তিনি তন্ত্রের পুঁথি খুলে বসলেন নিজেই। ছুটে গেলেন বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে, সব শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ তাঁর ঠিক বোধগম্য হচ্ছে কিনা, সেইটে মিলিয়ে নিতে। মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য হিন্দুস্থানী পণ্ডিতদের কাছে গেলেন। কিন্তু তার আগে আর একটা উপায় চিন্তা করে মায়ের কাছে কথাটা পাড়লেন, 'মা, তুমি তীর্থবাস করতে চেয়েছিলে, এখন যাবে? এখন ত যাহোক একটু স্বচ্ছল অবস্থা হয়েছে, কাশীতে গিয়ে থাকো না?'

মা আমতা আমতা করে বললেন, 'তা বটে—তীর্থে থাকতে কার না সাধ! তবে তোর একটা দেখা-শোনার লোক হ'ল না। ঘর-সংসারই বা দেখে কে? তোকে ভাত-জল দেওয়া—'

একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলেন বরদা, 'সে ভাবনা আর কতকাল ভাববে মা? তুমি মরে গেলে কে আমাকে দেখবে?'

'সে তখন আলাদা কথা। বেঁচে থাকতে না ভেবে কি করি বল?'

'তাহলে তুমি যাবে না?'

'তুই একটা বিয়ে কর ত যাই।'

'সে আমি পারব না।' দৃঢ়কণ্ঠে বলেন বরদা।

'তাহলে আমিও যাবো না।'

আরও পীড়াপীড়িতে আসল কথাটা বলে ফেলেন, 'এই বুড়ো বয়সে শরীর ভেঙে আসছে, এখন একা কোন নির্বান্ধব পুরীতে থাকব বল দেখি? বড় ভয় করে যে!'

'বেশ, সঙ্গে যদি লোক দিই।' বরদা প্রশ্ন করেন।

'কেন বল্ দেখি আমাকে তাড়াবার এত তাগিদ? আমি না বিদেয় হলে বুঝি বিয়ে করবিনি?....লোকই না-হয় দিলি। হঠাৎ যদি মরে যাই, এক ছেলে, একটু জলও পাবো না?'

অগত্যা সে প্রস্তাব বন্ধ করতে হয়।

এই একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে আসল কথাটা বলা চলে না। বললেও মা বিশ্বাস করবেন না। ছেলের অসাধারণ মাতৃভক্তির কথা তিনি সকলকে গর্ব করে বলে বেড়ান।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত যজ্ঞেই বসতে হয়। নিজে নিষ্ঠাপূর্বক সমস্ত আয়োজন করেন। ঘি তৈরি হয় গোরুর দুধ থেকে, সর জ্বাল দিয়ে। এতটুকু ত্রুটি কোথাও না থাকে এই প্রতিজ্ঞা। আগের দিন উপবাস করে থাকেন। পাঁজি দেখে সময় ঠিক করে যজ্ঞে বসেন। জ্ঞানত কোথাও কোন খুঁত রইল না। যজ্ঞের শেষে বিধিপূর্বক কবচ বেঁধে দিলেন মায়ের হাতে, কারণ বললেন, 'তোমার একটা বড় ফাঁড়া আছে মা, শিগ্গীরই।'

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এই এত বড় যাগটা করলি কি তুই আমার জন্যে?···হ্যাঁ?···বলিস কি রে—কি পাগল রে তুই!'

'কেন, পাগল কেন?'

'আমি ত বুড়ো হয়েছি, না হয় মলুমই। তার জন্যে এত ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

কথাটা সেদিন এইখানেই চাপা পড়ল বটে, কিন্তু শেষ হল না।

মুখে ব্যাপারটা যতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিন, মায়ের মনের মধ্যে সেটা বহুদূর প্রসারী হয়ে আশ্রয় নিলে। কয়েক দিন ধরেই কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে একদিন এসে বললেন, 'বাবা, একটা কথা বলব তোকে, রাখবি ?'

বরদা বললেন, 'বিয়ের কথা ছাড়া যা বলবে তুমি, রাখব।'

মা বললেন, 'এই ত ? কথা দিচ্ছিস ?'

বরদা ঘাড় নাড়লেন।

মা বললেন, 'ফাঁড়ার কথা ত বাবা কিছু বলা যায় না—তাছাড়া এমনিই ত প্রায় ষাট বছর বয়স হল—কবে আছি, কবে নেই। তুই আমাকে নিয়ে একটু তীর্থ করিয়ে দে। তাছাড়া শুনেছি, তীর্থস্থানে অনেক সময় গ্রহ-ফাঁড়া কাটে !'

জ্যোতিষী বিস্মিত হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না। সময় নিকট হয়ে আসছে, একি তারই পূর্বাভাষ ?

খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'যদি লোক দিই সঙ্গে ?'

'না, সে হয় না। মরণের সময় তুমি কাছে থাকবে না—এ হতে পারে না। তোমাকে ছাড়া আর আমি থাকব না।'

'বেশ তাই হবে।'

দেনার শেষ হাজার টাকা শোধ করবেন বলে জ্যোতিষী তৈরি হচ্ছিলেন, সেই টাকা সম্বল করেই দোরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভারতভূমিকে বামাবর্তে পরিক্রমা করলেন তিনি। কলকাতা থেকে পুরী, সেখান থেকে সিংহাচল, গোদাবরী, পক্ষীতীর্থ, শ্রীরঙ্গম্, রামেশ্বর, কন্যা-

কুমারী হয়ে বোম্বের পথে নাসিক, পঞ্চবটী, প্রভাস, দ্বারকা, পুষ্কর সেরে মথুরা বৃন্দাবন হয়ে সোজা চলে গেলেন হরিদ্বার ; সেখান থেকে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ হয়ে কাশী এসে নামলেন। মাকে বললেন, 'মোটামুটি তোমার সব সারা হয়ে গেল মা, বাকী শুধু রইল গয়া—যাবার পথে বাবার পিণ্ডটা দিয়ে ফিরব।'

'তা যা হয় করিস বাবা। এখন কাশীতে দুদিন বিশ্রাম কর। বাব্‌বা, হাঁপিয়ে উঠেছি।'

বরদাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রস্তাবটা তাঁর ভাল লাগল। তাই, ধর্মশালাতে তিন দিনের বেশি থাকতে দেয় না বলে পাণ্ডার সাহায্যতায় গণেশ মহল্লার একটা বাড়িতে দৈনিক চার আনা ভাড়ায় ঘর ঠিক করলেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন সে বাড়িতে—তিনিই ঘর ভাড়া দেন! সংসার চালাবার এই-ই একমাত্র অবলম্বন; তাঁর নিজের দুর্দান্ত হাঁপানি, কাজকর্ম কিছুই করতে পারেন না। এ-আয়েই বা কি হয়, শুধু কাশী জায়গা বলেই চলছে। ওধারে মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে, আঠারো পেরিয়ে যায় যায়—বিয়ে দেবার কোন উপায় নেই, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না! পয়সা নেই, কে আর নেবে তার মেয়েকে? ইত্যাদি অনেক দুঃখের কথাই বললেন বাড়ি ভাড়া দেবার সময় ভদ্রলোক। বরদা কৌতূহলী হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন, বেশ সুশ্রী মেয়েটি—যৌবনে ও স্বাস্থ্যে টলোমলো। ময়লা কাপড়ে ও নিরাভরণ অবস্থাতেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে মনে স্থির করলেন বরদা অবসর সময়ে মেয়েটির হাত দেখবেন।

কিন্তু সে-অবসর আর মিলল না।

সেইদিনই মা গেলেন কেদারনাথ দর্শনে। কী মনে হলো—বললে, এখানে স্নান করব বাবা একটু।'

'সে কি মা, এমন অসময়ে? সকালে ত স্নান করেছ।'

'তা হোক বাবা, এসেছি—এখানে স্নান করব না!'

তিনি নামলেন জলে। দু-পা নেমেই কিন্তু বলে উঠলেন, 'এ বড্ড পেছল রে, ও বাবা, ধর ধর, আমাকে—'

তখন স্নানার্থী কম। অপরে কেউ হাত ধরবে, সে সম্ভাবনাও নেই বরদা ব্যস্ত হয়ে জামা-কাপড় সুদ্ধ নেমে এলেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে সাবধান হননি—তাঁরও পা গেল পিছলে—সেই অবস্থাতে সামলাবার আগেই গিয়ে পড়লেন মার ওপর। হাত ধরার আর অবসর হল না, চোখ মেলবার আগেই মা কোথায় তলিয়ে গেলেন।

তারপর চেঁচামেচি, হৈ-চৈ যা হবার সবই হল। অনেক কষ্টে, বহু চেষ্টায় দেহ খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু সে মৃতদেহ।

বরদা কথা কইলেন না, কাঁদলেন না—চুপ করে একদিকে চেয়ে বসে রইলেন। শুধু দৃষ্টিটা তাঁর যেন আরও উগ্র, আরও ভয়ানক হয়ে উঠল।

যাই হোক—লোকজন ততক্ষণে বিস্তর এসে জড়ো হয়েছিল। খবর পেয়ে ওঁর নতুন বাড়িওয়ালাও এলেন, সঙ্গে তাঁর মেয়ে সরমা। সরমাই সাহস করে এগিয়ে এসে বললে, 'উঠুন—এমন করে বসে থাকলে ত চলবে না—মায়ের শেষ কাজ আপনাকেই ত করতে হবে। মায়ের ঋণ শোধ করুন।'

'তা বটে।'

এতক্ষণে বরদা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন চারিদিকে। উঠে দাঁড়াতে গেলেন, মাথাটা কেমন টলে উঠল—সরমা ভাগ্যে ওঁকে লক্ষ্য

করছিল, তাড়াতাড়ি হাতটা ধরে ফেলতে সে যাত্রা সামলে নিতে পারলেন। সরমাই হাত ধরে ওঁকে টেনে নিয়ে গেল মায়ের মৃতদেহের কাছে।

স্থানীয় লোকদের সহৃদয়তায় পুলিশ হাঙ্গামা আর কিছু হল না, শব দাহ করার অনুমতি পাওয়া গেল সহজেই। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ারও লোক মিলল। শেষ কাজ ভালভাবেই সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু দাহ সেরে বাড়ি ফিরে বরদা যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। হাত-পা যেন তাঁর নয়—নিজের কোন ইচ্ছাশক্তিও নেই। বিহ্বল, জড় হয়ে পড়েছেন। সেই তীক্ষ্ণধী, কটুভাষী ভয়ঙ্কর জ্যোতিষীকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তাঁর মধ্যে! তিনি শিশুর মত অসহায়, বৃদ্ধের মত পরনির্ভরশীল হয়ে উঠলেন।

এই সঙ্কটমুহূর্তে সরমা তাঁর যা সেবা করলে—অসাধারণ। দেখা গেল, মেয়েটির শুধু রূপই নেই, গুণও আছে। সে একেবারে নিকট-আত্মীয়ার মতই বরদার সব ভার নিজের হাতে তুলে নিলে। যেন বহুকালের পরিচয়, এইভাবে সে সমস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঁর কাছে এসে দাঁড়াল। নিপুণা গৃহিণীর মতই সব দিকে তার নজর—জননীর মতই অতন্দ্র ও অস্খলিত তার সেবা। বরদা মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেন না—সব ভারই তিনি এই মেয়েটির ওপর তুলে দিয়ে যেন বাঁচলেন। দুপুরের হবিষ্যের যোগাড় করা, রাত্রের জলখাবার—শ্রাদ্ধের তিল বাছা, সব কাজই সহজে সরমার ওপরে এসে পড়ল। বরদা নির্লিপ্ত উদাসীনতার সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন শুধু।

শ্রাদ্ধশান্তির পর বরদা বাড়ি ফেরবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বিদায়ের পূর্বে সরমার বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে কথায় কথায় বললেন, "আপনাদের ঋণ আমার শোধ করার উপায় নেই—তবু যদি কিছু

করবার থাকে ত বলুন। আপনাদের সামান্ত কিছু উপকার করতে পারলেও খুশি হবো।'

ব্রাহ্মণ খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'সত্যি সত্যিই উপকার করতে চান? করবেন?'

'নিশ্চয় করব—অবশ্য সাধ্যে কুলোলে।'

'কথা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ!'

'তাহলে আমার কন্যাটিকে আপনি গ্রহণ করুন—ও আপনার খুব অনুপযুক্ত হবে না!'

'সে কি!' শিউরে চমকে উঠেন বরদা!

'ব্রাহ্মণের কন্যাদায়ের কাছে আর কি আছে বলুন! আপনিও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণই গাত!'

'কিন্তু বিবাহ আমি যে কখনই করব না স্থির করেছি।'

'ও, স্থির করেছেন। সেটা কোন বাধা নয়। আপনি আমাকে কথা দিয়াছেন যে, সম্ভব হলেই আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন। এক্ষেত্রে অসম্ভব কোন বাধা নেই।'

''আপনি সেসব কথা বুঝতে পারছেন না—সে হবার নয় কার্তিকবাবু!' ব্যাকুল হয়ে বলেন বরদা জ্যোতিষী।

মধু-তিক্ত কণ্ঠে কার্তিকবাবু বললেন, 'হবার যে নয় তা ত জানিই। তাই ত চুপ করেই ছিলাম। দরিদ্রের কন্যাকে কে আর নিতে চাইবে বলুন! নেহাৎ আপনি কথাটা তুললেন বলেই তাই—'

অভিমানের সুরই তাঁর কণ্ঠে।

বরদা একবার চোখ বুজে মাকে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর মানসচক্ষুতে ফুটে উঠল নিজের কররেখার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—কিন্তু সে

মুহূর্তের জন্য। সেসব ছবি মিলিয়ে একাকার হয়ে জ্বল জ্বল করতে লাগলো, একটি যৌবনবিকসিত মুখের সরস পরিপূর্ণ ওষ্ঠাধর, বিচিত্র এক লাস্যভরা হাসি—এবং দীর্ঘ পক্ষবেষ্টিত চোখের আবেশ-ভরা মদির চাহনি। সরমা! তাই ত বটে।

অস্ফুট-কণ্ঠে বরদা জ্যোতিষী বললেন, 'নিয়তি!'

কার্তিকবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কী বললেন!'

বরদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন, 'তাই হবে। আপনাকে আমি কথাই দিলাম। তবে মাস ছয়েক অপেক্ষা করতে হবে। মাস ছয়েক পরে কাশীতে এসেই মায়ের সপিণ্ডকরণ সেরে নব—সেই সময়েই বিবাহ হবে।'

'আমার কিন্তু কিছু দেবার সঙ্গতি নেই—এক ভরি সোনাও বোধ হয় দিতে পারব না।'

'দরকার নেই, আপনি রুলি দিয়েই বিয়ে দেবেন।'

বরদা জ্যোতিষীর মত চেহারার এবং বয়সের পাত্রকে সরমার মত মেয়ের হয়ত পছন্দ হবার কথা নয়, কিন্তু সরমা তবু আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই স্বামীকে একান্তমনে অবলম্বন করতে, ভালবাসতে চেয়েছিল। আশ্চর্য এই যে, বাধা এল বরদার কাছ থেকেই। কিসের সে বাধা—ওর এই আবেগময় আত্মনিবেদন গ্রহণ করতে কোথায় বরদার সঙ্কোচ, তা সরমা বুঝতে পারে না। ব্যথিত হয়, বিস্মিত হয়।

তবু বাধা আছে একটা কোথাও এটা ঠিক। আদালতে প্রমাণ করার মত তার কোন প্রত্যক্ষ তথ্য না থাকলেও সরমা সমস্ত অন্তর দিয়ে সেটা অনুভব করে। কোথায় একটা

প্রাচীর আছে দুজনের মধ্যে, আর সে প্রাচীর দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

সরমা যখন আবেশে, আনন্দে, অত্যুগ্র কামনায় ওঁকে জড়িয়ে ধরতে যায়, তখন বেশ অনুভব করে যে, বরদা কেমন যেন শিটিয়ে ওঠেন, কঠিন হয়ে যান। ওর যৌবনপুষ্ট কমনীয় বাহু দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে নিজের ওষ্ঠাধর এগিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁর চুম্বন করতে মনে থাকে না—বরং কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে। নিজের বাসনা ধিক্‌ত হয়ে ফিরে আসে। রাত্রের রসালাপ জমে না—কথা কইলে উত্তর মেলে না, আপন-মনেই কি ভাবতে থাকেন বরদা।

ক্রমশ সরমা অনুভব করে যে, তার সম্বন্ধে একটা সন্দিগ্ধ ভাব আছে বরদার মনে। যখন যেখানে যে কাজেই থাক না কেন, মনে হয়, তাঁর একটা সজাগ চোখ আর কান ওকে অনুসরণ করছে সর্বদা। সোজাসুজি যখন তাকিয়ে থাকেন, তখনও সে দৃষ্টিতে রূপ-যৌবনের প্রশংসা ফুটে ওঠে না, ফোটে না তাতে লালসা—শুধু একটা সন্দেহ, একটা অবিশ্বাস, নির্ভরশীলতার অভাবই দেখতে পায়!

তবু সরমা বোঝে যে, এটা স্ত্রী সম্বন্ধে স্বামীর ঠিক সাধারণ অবিশ্বাস বা সন্দেহ নয়—তাছাড়াও কিছু একটা। কী যেন ভাবেন ইনি সদাসর্বদা, আর সে তাকে কেন্দ্র করেই।

কিন্তু রাগ হয় ওর এই জন্য যে, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেও বরদার কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায় না। কী ভাবেন উনি, কেন ভাবেন? কি মনে করেন ওকে—ওকে কি তাঁর বিশ্বাস হয় না? কেন হয় না? আরও কি চান উনি ওর কাছ থেকে।

এসব প্রশ্নের কোন জবাবই মেলে না, শুধু সেই বিচিত্র চাহনি মেলে স্থির হয়ে থাকেন বরদা। ওর অন্তরের সমস্ত আকুলতা যেন এক পাষাণ প্রাচীরে ঠেকে বৃথাই মাথা কুটে ফিরে আসে।

তবু কিছুদিন সে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিল। আদর না হোক, আদরের অভিনয়ও করেছিলেন। ক্রমশ সে সুখও চলে গেল—বরদার পশার বেড়েছে, বাইরের ডাক ও কাজ—দুই-ই বেশি। লোক যখন থাকে না, তখন টেবিল ল্যাম্পের আলোতে ঝুঁকে পড়ে পুঁথি আর খাতার পাতা ওল্টান; মাঝে মাঝে নিজের কররেখার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। সরমার যৌবনের সুরা যত তাঁকে মাতাল করতে চায়, ওর রূপের আগুন তাঁর দেহের পতঙ্গটাকে যত আকর্ষণ করে, ততই তিনি কঠিন হয়ে থাকতে চেষ্টা করেন, আর বার বার ব্যর্থ আগ্রহে পুঁথির পাতার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করেন—যদি এখনও কোথাও তাঁর হিসাবের ভুল বার হয়, যদি এখনও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় তাঁর আশঙ্কা।

এমনি করে ভুল বোঝবার পাঁচিল ধীরে ধীরে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে।

আশঙ্কা ও সংশয় থেকে বীতরাগ, বীতরাগ থেকে বিদ্বেষ জন্মায় সরমার মনে। ও বিদ্রোহ করে স্বামীর এই অকারণ সন্দিগ্ধতার বিরুদ্ধে। ওর পরিপূর্ণ যৌবনের ডালি স্বামী ত দুপায়ে করে সরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তাঁর প্রয়োজন নেই—তার সম্বন্ধে এত সতর্কতা কেন, এত আগলাবার চেষ্টা কেন? সে কি করেছে? কার সঙ্গে মিশেছে, মেশবার লোকই বা কৈ? তবে এত সন্দেহ, এত আশঙ্কা কেন?

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সরমা এক সময়ে। সে এর শোধ নেবেই। ঐ ত চেহারা ওঁর, যৌবনে ভাঁটা পড়েছে কবে, শীর্ণ, রুক্ষ, বৃদ্ধ

—ওঁর এত অহঙ্কার! ওকে বাড়িতে এনে এমন করে অবহেলা করবেন?

সে অকস্মাৎ শুরু করলে স্বামীকেই সম্পূর্ণ অবহেলা করতে। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার খবর নেওয়া হয় না—দিনরাত নিজের প্রসাধন ও বেশভূষা নিয়েই থাকে। বাড়ির ছাদ থেকে ডেকে ডেকে আশে-পাশের বাড়ির সঙ্গে আলাপ জমায়—ফলে মধুলোভী ভৃঙ্গও দু-একজন পাড়ায় চঞ্চল হয়ে ওঠে বৈকি!

নিয়তির এই ইঙ্গিত ক্রমে বরদাও দেখতে পান। তিনি আর একবার প্রস্তুত হন সংগ্রামের জন্য। কবচ তৈরি করে ধারণ করেন, স্ত্রীর বাহুমূলে বেঁধে দেন। নানা পাথরের আংটিতে তাঁর হাত ভরে যায়।

এধারেও সতর্কতার শেষ নেই। ছাদে উঁচু করে পাঁচিল তুলে দিলেন। বাইরের লোকজনের সঙ্গে মেশা নিষিদ্ধ হল, কড়া পাহারা দিতে লাগলেন সর্বদা নিজেই। একদিন ঝিকে পাড়ার একটি ছোকরার সঙ্গে গল্প করতে দেখে তাকে জবাব দিয়ে দিলেন তখনই। খুঁজে নিয়ে এলেন পুরানো এক চাকরের সুপারিশে এক ছোকরা চাকরকে। নেহাৎই বালক সে—সতেরো-আঠারো বছর বয়স হবে বড় জোর। তাকে নিভৃতে ডেকে বুঝিয়ে দেন যে, কড়া নজর রাখাই তার সর্বপ্রধান কর্তব্য।

নীরবে সব লক্ষ করে সরমা। কিন্তু কিছু বলে না, শুধু ওর চোখ দুটো হিংস্র হয়ে ওঠে। সাপের মত তা ক্রূর এবং অব্যর্থ। প্রতিহিংসার জন্য সেও প্রস্তুত হল। না, এ অপমানের উপযুক্ত জবাব সে দেবেই।

মনে মনে হেসে সে মনোযোগ দিলে চাকরটির ওপরেই। আঠারো বছরের ছেলে, সে রূপের আগুনে নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল,

সামান্যতম প্রয়াসের অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু এ প্রতিশোধেও মন উঠল না সরমার। যখন বিশ্বাস রইল না, রইল না ভালবাসা—কোন আশা নেই, আনন্দ নেই, তখন এ-খাঁচায় বদ্ধ থাকবে কেন?—সে জানে, বিশাল পৃথিবীতে তার অন্তত অর্থের এবং সম্ভোগের বস্তুর অভাব হবে না—শুধু যা নেমে যাবার অপেক্ষা।

শুধু যেন কল্পনারই অপেক্ষা ছিল! প্রথম যেদিন অবসর মিলল, মানে যে সন্ধ্যায় মক্কেলের ভীড় বেশি দেখলে—ইঙ্গিতে চাকর খগেনকে ডেকে নিয়ে গেল ওপরের ঘরে, ওর নিকষ কৃষ্ণদেহ নিজের সুগৌর বাহু-বেষ্টনে জড়িয়ে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এল, তারপর কাজলটানা চোখের মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তি-মদির দৃষ্টি ওর দৃষ্টির ওপর নিবদ্ধ করে বললে, 'এই আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবি?'

আবেগে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে খগেন। সে শুধু বললে, কোথায়?'

'যেখানে হোক—খুব দূর দেশে কোথাও—এখানে আর থাকব না, শুধু তুই আর আমি কোথাও ঘর করব।'

এ যে অপ্রত্যাশিত সুখ আর সৌভাগ্য। খগেন ঠিক নিজের অদৃষ্টকে বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, 'কিন্তু বাবু যদি পুলিশে দেয়?

'আমি বলব, নিজের ইচ্ছেয় চলে এসেছি। পুলিশ কি করবে?'

'খাবে কি? আমার আয় ত এই, অন্য জায়গায় গেলে কি আয় বেশী হবে?'

'এই ত গয়না রয়েছে আমার এত। কোথাও গিয়ে মুড়ি-বেগুনির দোকান দেব। আমি ভাজব, আর তুই বেচবি? কেমন?

খগেনের চক্ষু লুব্ধ হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের এ-ছবিতে। তবু বলে, 'সে কষ্ট কি তুমি সইতে পারবে?'

'খু-ব।'

'বেশ চলো। কিন্তু আমার বড় ভয় করে।'

সাপের মত হিস্ হিস্ করে ওঠে সরমার কণ্ঠস্বর। সে বলে, 'কিছু ভয় নেই—আমি আছি।'

'বেশ, কবে যাবে বলো ?

'কবে কি রে, এখনই।'

'এখনই ?'

'হ্যাঁ—ও বাইরে ব্যস্ত আছে, চুপি চুপি এধারের দোর দিয়ে, ও গলি দিয়ে বেরিয়ে যাব—'

'কিন্তু জিনিসপত্র ? কাপড় চোপড় ?'

'কিছু দরকার নেই, তাতে দেরি হয়ে যাবে। লোকে সন্দেহ করবে। কিছু নগদ টাকা আছে আমার হাতে। সব কিনে নেব।'

মূঢ় পতঙ্গের বাধা দেবার আর শক্তি ছিল না। নিয়তির মত নিষ্ঠুর ঐ মেয়েটির ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে সে সহজেই।

সরমারও আর তর সইছে না. খগেনকে ওর প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন থাকবেও না দুদিনের বেশী—এটা শুধু চরম প্রতিশোধ নেওয়া ওর স্বামীর ওপর।

ওর চোখ অদ্ভুত একটা আনন্দে জ্বলতে থাকে।

তখনই একবস্ত্রে খগেনের সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করলে, ফেলে রেখে গেল শুধু বাঁ হাতে বাঁধা কবচখানা—

মক্কেলদের সঙ্গে কথা কইবার ফাঁকে ফাঁকে বরদা একটা কান পেতে রাখতেন ভেতর দিকে সর্ব্বদাই। আজ যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ

ঠেক্‌ল। কোন মতে সবাইকে বিদায় করে ভেতরে উঠে এলেন এক সময়ে।.......

বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই প্রথমে নজরে পড়ল সদর দোরটা খোলা হা-হা করছে। ছুটে ভেতরের উঠানে এসে দাঁড়ালেন। সারা বাড়ীটা নিস্তব্ধ। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'খগেন!'

সাড়া নেই।

ডাকতে গেলেন, 'সরমা!' গলা কেঁপে কেমন একটা বিকৃত স্বর বেরোল। ছুটে ওপরে এলেন, সব ঘর খোলা, সব খালি। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই।

একটা ঘর থেকে আর একটায়, ওপর থেকে নীচে বার কতক ছুটে বেড়ালেন—এক সময়ে পায়ে ঠেক্‌ল, কী একটা জিনিস। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলেন কবচটা।

এইবার হা-হা করে হেসে উঠলেন। অট্টহাসি। শূন্য বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে সে হাসি ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে হাসি পাগলের হাসি ঠিক নয়। কেমন যেন পৈশাচিক হাসি।

খুব খানিকটা হেসে নেবার পর বরদা নিজের হাতের কবচখানা টান্ মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আংটিগুলো খুলে নিয়ে নিজে হাতে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিলেন। তারপর আবার একচোট হেসে উঠলেন, হা-হা, হা-হা!

এর পর বরদা আর একবার বিবাহ করেছেন। এও তাঁর কোষ্ঠীতে ছিল। এ স্ত্রীকে কারণে অকারণে নানারকম নির্যাতন করেন। জানেন যে এ কোথাও যাবে না। এবার তিনি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এর পর থেকেই মানুষের ভাগ্যের অন্ধকার দিক দেখার নেশা তাঁর আরও বেড়ে গিয়েছে, সে ক্ষমতাও যেন দিন দিন মানুষের সাধারণ ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে চলেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তীব্রতর স্বরে নিয়ম ও অব্যর্থ নিয়তির অমোঘ নির্দেশকে তিনি অনায়াসে উদ্ঘাটিত করেন। হতচকিত, ভাগ্যতাড়িত হতভাগ্যদের শঙ্কা বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে তিনি যেন কী এক অপূর্ব আনন্দ পান, কেমন এক রকম প্রতিহিংসার আনন্দ।

আর মাঝে মাঝে হেসে ওঠেন অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ আর তীব্র বিদ্রূপের হাসি, সে হাসি যেন চারিদিকের স্তব্ধতাকে কেটে কেটে দূর থেকে দূরান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

রাণু মাসিমার অসুখ

কথাটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভাল ক'রে জ্ঞান হবার আগে থেকেই আমরা শুনছি—এখন ত বয়স প্রায় চল্লিশে পৌঁছল। কথাটা নিশ্চয় তার আগেও বহু লোক শুনেছে। সমস্ত আত্মীয়-পরিজন-পরিচিত মিলিয়ে যে জগৎ, তার আকাশ বাতাস ঐ কথাটিতে পূর্ণ হয়ে আছে বহুকাল থেকে। বহুবার শোনার ফলে তা নিশ্চিত বিশ্বাস, এমন কি, হয়ত বা সত্যেও দাঁড়িয়ে গেছে। অন্তত সংশয় করার কথা কারুর কল্পনাতেও ওঠেনি কোনদিন।

রাণু মাসিমার শরীর খারাপ। তিনি আর বেশি দিন নন্।

এ সংবাদ কবে প্রথম কে কাকে দিয়েছিল তা আমরা জানি না। বোধ হয় কেউই জানে না আজ আর। ওঁর বাবা মা জানতেন; তাঁরা

সেইজন্য যত্ন করতেন এই সন্তানটিকেই সবচেয়ে। তটস্থ থাকতেন তাঁরা। ঐ বুঝি রাণুর আবার শরীর খারাপ হ'ল—এই আশঙ্কায় সবাই কণ্টকিত থাকতেন। ওঁদের আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম-কাজ-কর্মের অবসরবিনোদন প্রভৃতি দিন এবং রাত্রির সমস্ত কাজ ঐ একটি কথার ওপর আবর্তিত হ'ত। 'রাণুর শরীরটা বড্ড খারাপ দিদি।' 'রাণুটার জন্যই ভাবনা ভাই'—এছাড়া তাঁর মায়ের মুখে নাকি কোন কথা থাকত না।

কেউ হয়ত বললে, 'আজকাল খুব ভাল চিংড়ি আসছে বাজারে কর্তা আনেন না?'

'না ভাই চিংড়ি ত বাড়ী ঢোকেনা, রাণুর যে চিংড়ি মাছ মোটে সহ্য হয় না!'

রাণুর শরীর খারাপ ব'লে বাড়ীর যে সবচেয়ে ভাল গরুটি তার দুধ থাকত রাণুর জন্য। বাড়ীতে সর-জ্বাল-দেওয়া ঘি হ'ত সামান্যই—সেটা শুধু রাণুর খাবার করতে, তাঁকে ভাত-পাতে দিতে কিংবা তাঁর জলখাবারের চিঁড়ে ভাজতেই ব্যয় হ'ত। দুধের মোটা সরখানা তুলে রাখা হ'ত রাণুর জন্য। আঙুর যখন দেড় টাকা বাক্স বিক্রী হ'ত, তখনও ওর বাবা কিনে আনতেন মেয়ের জন্য। ওর শরীরটা দেখতে হবে ত! পয়সাটা বড় কথা নয়।

এতটা উদ্বেগ অস্বাভাবিক ভাবছেন আপনারা? মোটেই তা নয়। যে জ্যোতিষী রাণু মাসিমার ঠিকুজী করেছিল সে বলেছিল রাণু মাসিমার পরমায়ু খুব অল্প। তার ওপর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণু মাসিমার যখন সর্দি জ্বর কাশি এবং অম্লপিত্তের অসুখের মাত্রা বাড়তে লাগল তখন সবাই বুঝল যে জ্যোতিষীর কথাই ঠিক—মেয়েটি আর বেশি দিন নয়। বারো মাসই খ্যাঁত খ্যাঁত করত ওর শরীর, সুতরাং দিনরাত শুধু শুধু না

করলে চলে না।...বাপ-মায়ের স্নেহটা অবশ্য এমনিতেই বেশী পড়ার কথা ওঁর ওপর, বাগানের সেরা ফুল এটি, সবচেয়ে সুশ্রী সন্তান। রাণুর জন্যে বাপ মায়ের গর্বের শেষ ছিল না। রাণু কাঁকরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে তাঁদের বুকে ব্যথা বাজত।

রাণু মাসিমার বিয়েও হয়েছিল তাড়াতাড়ি—ঠিক চৌদ্দ বছর বয়সে। বাঁচবেই ত না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সাধ-আহ্লাদটা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল, সেদিন এই ছিল বোধ হয় তাঁদের চিন্তা। মস্ত বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'ল, ছেলেটি বি, এ পাশ ক'রে আইন পড়ছে। আইন পাশ করে উকীল হবে। বাপ বড় উকীল, পসারের অভাব হবে না। ফুটফুটে মেয়ে দেখে তাঁরা একেবারে বিনা পয়সাতেই নিয়ে গেলেন।

কথাটা কেমন ক'রে সেখানেও রটে গেল, 'রাণু বৌমার শরীরটা বড় খারাপ, ওকে একটু সাবধানে রাখা দরকার।'

ততদিনে কিন্তু তাঁর সেই পুরাণো উপসর্গগুলো চলে গেছে। সর্দিকাশি হয় কদাচিত, জরজাড়ি তো হয়ই না। পেটেরও কোন গোলমাল হ'তে বিশেষ দেখা যায় না।

তবে?

এই তবেটারই উত্তর আমাদের জিতেন মেসোমশাই অনেক ছুটোছুটি ক'রে সংগ্রহ করেছিলেন। তখনকার দিনের বড় ডাক্তার কেদার দাসের কাছে যাওরা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'শরীর ত এর খাসা আছে। কৈ রোগ ত নেই!

ডাক্তারের এই নিবুদ্ধিতায় রাণু মাসিমা এমন চটে গেলেন যে, তাইতে তাঁর রোগ আরও বেড়ে গেল। কে একজন পরামর্শ দিলে শিবপুরের দীন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। তিনি দেড়ঘন্টা বসিয়ে

রেখে পরীক্ষা করে প্রায় পাঁচমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'একে এনেছ কেন? এর ব্যামোটা কি? খোরাক খালি!'

এতে এমন 'শক' লেগেছিল যে মাসীমা সাতদিন শয্যাগত ছিলেন।

শ্বশুরশাশুড়ী স্বামী সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দেখা যাচ্ছে শরীর খারাপ—অসুখ কেন ধরতে পারছে না ডাক্তার?

বড় ডাক্তার আর. এল. দত্ত অবশেষে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'নার্ভাস ডেবিলিটি। মনে করে শরীর খারাপ, তাইতে আরও শরীর খারাপ হয়। কবিরাজ দেখাও প্রবীণ দেখে।'

প্রবীণ কবিরাজ একজন বললেন, 'হ্যাঁ, দত্তমশাই ঠিকই বলেছেন। স্নায়বিক দৌর্বল্যের সঙ্গে হৃদরোগ···দুধের সর আর মিশ্রির গুঁড়োর সঙ্গে মকরধ্বজ দেবে। একছটাক করে বেদানার রসের সঙ্গে পটলের সত্ত্ব দুবার। আর সুজির রুটি পথ্য—ডুমুরের ডালনা টালনা এমনি সব ঠাণ্ডা তরকারী খাবে।'....তখন পটলের সময় নয়, বলা বাহুল্য।

এঁরা নিশ্চিন্ত হলেন যেন। অসুখ যখন একটা নিশ্চিত জানা গেল তখন আর ভাবনা কি! তারপর যত্ন আর সেবার ঠাসবুনান চলল। জিতেন মেসোমশাই বছরে দুবার চেঞ্জে নিয়ে যেতেন নিয়মিত। নিজস্ব ঝি চাকর রাখা হ'ত। যে সময়ের যেটি দুর্লভ বস্তু সেটি খেলে মাসিমার শরীর ভাল থাকে। অর্থাৎ কপির সময় পটল এবং পটলের সময় কপি। তার জন্য নতুন বাজার এবং হগ্ মার্কেট চষে ফেলতেন মেসোমশাই।

কোন কোন মন্দ লোক হয়তো বলত যে, 'বাবা, ঐ শরীর খারাপ!···মোটা মানুষ একটুতেই বুক ধড়ফড় করবে তার আর আশ্চর্য কি! আর যা খাচ্ছে ভাল মন্দ—পেটে গ্যাস হয়ে আরও বুকে লাগে। নইলে ওর অসুখটা কোথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীরা থামিয়ে দিতেন, 'মোটা হওয়াটাই ত রোগ ওটা কি স্বাস্থ্যের চেহারা ভাবছ? জল, জল শুধু। বুকের অসুখে অমনি ফোলে।'

কিন্তু জ্যোতিষীর কথাটা ঠিক খাটল না। রাণু মাসিমা কুড়ি থেকে ত্রিশ, ত্রিশ থেকে চল্লিশে এসে পড়লেন।

তবু তিনি কিন্তু সর্বদাই সে কথাটা স্মরণ করতেন। স্বামী ঠিক ওঁর অনুজ্ঞামত কাজ না করলে বলতেন, 'আর ক-টা দিনই বা আছি? এই কটা দিন একটু শান্তিতে থাকতে দাও। তারপর যা খুশি তাই ক'রো। একটি কথাও বলতে আসব না।'

খাওয়ার জন্যে কোন একটা মূল্যবান ফরমাস করেই বলতেন, 'আমের এখন বড্ড দাম? তাই ত। তা অল্প করেই আনো। খেয়ে নিই, এই হয়ত শেষ খাওয়া! আসছে বছর আমের সময় অবধি কি আর থাকবো?'

ছেলেমেয়েরাও এই আব্‌হাওয়ায় মানুষ হয়ে উঠল। তারা জন্মাবধিই শুনছে মায়ের শরীর খারাপ, বেশী দিন আর বাঁচবার আশা নেই। সুতরাং যা কিছু ভাল পথ্য সব মা খাবেন, তাঁরই খাওয়া উচিত। পূর্ণ বিশ্রাম চাই তাঁর। তারা ছেলেবেলাতেও কেউ চীৎকার করে কাঁদতে পায়নি। তখন থেকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে—মায়ের শরীর খারাপ, সাবধান। দাপাদাপি করে বেড়ানো, অকারণে চীৎকার করা, পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করা, এ ত স্বপ্নের অতীত। তারা চলে পা টিপে টিপে, কথা কয় আস্তে, হাসে মুচ্‌কে মুচ্‌কে।

বছর ত্রিশেক বয়সের সময় থেকেই রাণু মাসিমার স্বতন্ত্র সংসার। সুতরাং বাড়ীতে আর কেউ যে চেঁচামেচি করবে কি দাপাদাপি করবে সে

সুযোগ ছিল না। চাকর বাকররা সবাই জানতো কর্ত্রীর ভীষণ শরীর খারাপ। তারাও সেইমত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। খোকা ঝি চাকর রাণু মাসিমা সইতে পারতেন না, তাদের সঙ্গে অত বক্‌বে কে? বেশি কথা কইলে বুকে লাগে।

তাঁর জন্য ঘরের মধ্যেই মুখ হাত ধোবার বেসিন থাকত, ঝি থাকত সঙ্গে সঙ্গে—অষ্টপ্রহর। ওঁর সুবিধার জন্য পৈত্রিক বাড়ী ত্যাগ করে এসে বালিগঞ্জে বাংলো প্যাটার্ণ বাড়ী করলেন মেসোমশাই—যাতে দোতলা একতলার হাঙ্গামা না থাকে। রোজ বিকালে ডাক্তারের পরামর্শ-মত গাড়ীতে চেপে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন, আইতেই সবাই চিন্তিত থাকত। প্রথমত গাড়ীবারান্দার তিনটে ধাপ ভেঙে নামা, দ্বিতীয়ত পথের গোলমাল, গাড়ীর ঝাঁকুনি এ সব ত আছেই।

রাণু মাসিমা আবার কষ্ট হ'লেও মুখ বুজে সইতেন, চট্‌ করে জানা যেতনা—মেসোমশাইয়ের সেই এক দুর্ভাবনা। বেশি করে চোখ রাখতে হ'ত তাঁকেই।

এমনি করে আঙুর যেমন তুলোয় ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়, তেমনি ক'রে তাঁকে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখা হ'ত—বহু কষ্টে ও বহু চেষ্টায়।

তবু একসময়ে জিতেন মেসোমশাই-ই আগে মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর জন্য শোক করার অবকাশই পেলেন না। এই শক্‌ লেগে রাণু মাসিমার এমন বাড়াবাড়ি হ'ল যে তাঁকে নিয়েই সকলে অস্থির। যমে মানুষে টানাটানি। এমন কি তাঁর শ্রাদ্ধটাও সারা হ'ল কোন মতে নমোনমো ক'রে—পাছে আবার সে ধাক্কায় মাসিমা আরও কাতর হন।

মাসিমার হাতে পয়সার অভাব ছিল না। বাড়ী বিষয় সবই তাঁর

নামে। তিনি অতিকষ্টে বার কতক চেষ্টে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। ছেলে মেয়ের বিয়েও হ'ল। পুত্রবধূ এবং জামাতারাও এই যাব হাওয়ায় নিজেদের ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত করে নিলে। সবাই জানে যেটা ধ্রুবসত্য বলে, সেটাকে বিশ্বাস করতে, এমন কি মনের মধ্যে ধারণা করে নিতেও অসুবিধা হয় না।

কোনমতে বেঁচে আছেন উনি। আহা, কি কষ্ট! সত্যি, দিনরাত অক্ষম এবং পঙ্গু শরীর টেনে টেনে চলা—এর মত দুঃখ আর নেই! কি করেই হাসিমুখে সব সহ্য করেন বেচারী!···

জিতেন মেসোমশাই বেঁচে থাকতে একবার, বোধহয় প্লেগ না কী একটা হিড়িকে কলকাতা থেকে ঝি-চাকর সব অন্তর্দ্ধান হয়েছিল, হোটেল সুদ্ধ বন্ধ ছিল ক'দিন। সে সময়ে হিতু, ওঁদের বড় ছেলে সাত বছরের, সে বাসন মাজত, জিতেন মেসোমশাই নিজে রান্না করতেন, একদিন হাতই পুড়িয়ে ফেললেন বেচারী, তবু ওঁরা কেউ রাণু মাসিমাকে কাজ করতে দেননি। রাণু মাসিমার সে আর এক কষ্ট, কম ঝগড়া করেছেন? কিন্তু, হিতু বলে, 'বাবা বলতেন এই বাজারে আবার তোমার রোগ বাড়লে ডাক্তার পাবো কোথায়? ওসব মতলব ক'রো না। ঐ তো শরীর, আবার কাজ করবার সখ! ··হোটেল একটা খুলতে আমরা বেঁচে গেলাম। দুবেলা খেয়ে আসতাম. আর মায়ের জন্য নিয়ে আসতাম।'

হিতু স্ত্রীর কাছে গল্প করে। স্ত্রী রমার চোখ ছলছল করে শাশুড়ীর জন্য, 'আহা বেচারী!'

রাণু মাসিমা ষাট পেরিয়ে সত্তরের কাছে গেলেন এমনি করেই। কি করে যে এমন দুর্দান্ত রোগকে এতকাল ধরে কলা দেখিয়ে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ করলেন তা জানি না। কিন্তু হিতুও একদিন মারা গেল হঠাৎ।

রাণু মাসিমা এত বড় শোকে পাথর হয়ে গেলেন। তাঁকে কেউ শোক করতে দিল না অবশ্য। সবাই জানত ত যে ওঁর কী ভয়ানক অবস্থা হবে এর ফলে। সবাই তাঁকে ঘিরে বসে রইল দিনরাত। রাণু মাসিমা সে আঘাতও সহ্য করলেন কোন রকমে।

রাণু মাসিমা আজও বেঁচে আছেন। এখন তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। ইতিমধ্যে দুটি জামাই মারা গেছে, একটি মেয়ে ও আর একটি ছেলে। সব শোকই সহ্য করেছেন এমনি ক'রে।

তবে সেদিন যখন শুনলাম হিতুদার ছেলে নিতুও মারা গেল তখন মনে মনে ভাবলাম যে এইবার বুড়ী মরবে। রোজই সে খবরটার আশা করি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে চার মাস হয়ে গেল তবুও সে খবর শুনলাম না। কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠাতে গত সপ্তাহে তাঁর কাছে গিয়ে হাজিরই হ'লাম।

একটা আরাম কেদারায় শুয়েছিলেন। অতি কষ্টে সোজা হয়ে বসলেন।

'শুনেছিস রমু, আমার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল?'

'শুনলাম মাসিমা' নত মুখে উত্তর দিই, শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেম, 'কচি বৌটা, ওর মুখের দিকে চাইতে পারছি না। আমি বসে রইলুম আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে—আর সব যে যার চলে গেল। তাই কি ছাই ভগবান দেহটাকেই ভাল রেখেছেন যে ওদের জড়িয়ে নিয়ে থাকব, এই শোকে সান্ত্বনা দেব? উল্টে ওরা আমাকে নিয়েই অস্থির! এমন দেহ রাখবারই বা কি উদ্দেশ্য ভগবানের তা জানি না।'

বেরিয়ে আসছি ওখান থেকে, ওঁর নাতনী উমা প্রণাম করে বলে 'কাকাবাবু কখন এসেছিলেন? ঠাকুরমাকে দেখে এলেন?' উঃ বু ঐ দেহ নিয়ে কি ক'রে এই সবগুলো সহ্য করছে বলুন ত! ভাঙা দেহ নিয়ে চালানেও ত কম দিন নয়! ভাবতে অবাক লাগে, না?'

আমি বললুম, 'আমার বিস্ময়টা সেখানে নয় রমা।'

'তবে?' অবাক হয়ে বলে সে।

'ভাবছি ঐ বিপুল দেহ নিয়ে অনবরত বসে থেকেও অত দুধ-ছি ছানা মাখন সহ্য করেন কি ক'রে? এত যত্নেও যে বেঁচে আছেন সেইটে ভেবে অবাক হচ্ছি। ওঁর দেহ না জানি কী মজবুতই ছিল উমা।'

উমা কথাটা বুঝতে পারল না। পারবার কথাও নয়। তিন পুরুষ ধরে ওদের অস্থি-মজ্জাতে এই বিশ্বাস আছে যে রাণু মাসিমার শরীরে কিছু নেই, আগাগোড়া ফোঁপ্‌রা। কোনমতে বেঁচে আছেন তিনি, এবং আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

সে বিশ্বাস ভাঙবার চেষ্টা ক'রে লাভই বা কি?

আমি যেন একটা ঠাট্টা করেছি, এমনি ভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে এলাম।*

* গল্পটি খানিকটা লেখা হবার পর মম-এর একটি এই ধরণের গল্প চোখে পড়ল। দুটি চরিত্রের খানিকটা মিল আছে। তবু অনেকটাই নেই—সেই ভরসায় ছাপলাম।

ীনু রায়ের আত্মহত্যা

। কৌতূহল বোধ হয় অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। আমি মরবার পর ামার জন্য কে কে শোক করবে, কী ভাবে সে শোক প্রকাশ করবে, ার কতখানি শোকের গভীরতা—এ যদি আমি জানতে চাই ামাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। এমনি সকলকারই, ওটা আত্ম-প্রেমেরই একটা চরম মনস্তত্ত্ব, মরবার পর কতখানি শূন্যতাবোধ, কতটা ভাব রেখে যেতে পারবে, এইটে কল্পনা করে তবু মানুষ খানিকটা াত্মতৃপ্তি পায়, অর্থাৎ তার উপর দিয়ে নিজের মূল্য হিসাব করে। রবার সঙ্গে সঙ্গে এ পৃথিবীর এই বিপুল জীবনধারার সঙ্গে সমস্ত যোগ ছিন্ন হয়ে যাবে সত্যকথা, কোথাও কোন চিহ্ন থাকবে না এও ঠিক—তবু এই সত্যটাই যেন সহজে মেনে নিতে পারা যায় না। যেমন আজ র্য উঠছে তেমনি উঠবে; যেমন দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন াসে ঠিক তেমনি আসবে; ফুল ফুটবে চাঁদ উঠবে, কৃষ্ণপক্ষের রাতে ীরামুক্তা বসান দামী গহনার মতই ঝিক্‌মিক্ করবে আকাশটা, আজও যমন পাহাড়ের মাথায় নীল মেঘ জমে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করে তেমনি করবে; কত হাসি-গান-তামাসার বন্যা বয়ে যাবে নতুন ঘটনা ও নতুন াানুষদের নিয়ে; অর্থাৎ এই কোটি কোটি মানুষের জীবন পাঁচটি মহাদেশ ব্যেপে যেমন কাটছিল তেমনিই কাটবে, শুধু আমিই থাকবনা তার মধ্যে; জগতের আনন্দ যজ্ঞে সবাই আসবে হাসিমুখে শুধু আমারই আর নিমন্ত্রণ হবে না কোনদিন—এটা ভাবতে কারই বা ভাল লাগে? শুধু কি তাই? আমি চলে গেলে আর কারুর কোন ক্ষতি হবে না—যা

বেরিয়ে আসছি, কাঁদবে কিন্তু তাতে তাদের খাওয়া ঘুম কোনটারই কাকাবাবু কখন ব্যাঘাত ঘটবে না। ভাল করে ভাবলে এটা ভগবানের ঐ দেহ নিয়ে কি অবিচার বলে মনে হয় বৈকি।

নিয়ে চালাবে মানুষ তাই চায় প্রাণপণে বেঁচে থাকতে। নিতান্ত যখন আসি হয় না তখন চেষ্টা করে একটা বড় দাগ কোথাও কেটে রেখে জীবনের গায়ে। যারা শক্তিমান তারা ইতিহাসকে চিহ্নিত করে যায় নিজের নামের দ্বারা; যারা ঠিক অতটা নয়, তারা চেষ্টা করে একটা বড় বাড়ি, বড় সমাধি-গৃহ কি মন্দির তৈরি করে চিরস্থায়ী না হোক এই পৃথিবীতে নিজের অবস্থিতির ইতিহাসটাকে দীর্ঘস্থায়ী করে রেখে যেতে। যাদের সে ক্ষমতাও নেই, তারা মনে মনে বৃথা কামনা ক'রে অন্তরে অন্তরে রক্তাক্ত হয় শুধু যে, মানুষ হিসেবে মানুষের যা দাম সেইটুকুর মূল্যেই অন্তত আর কয়েকটি মানুষের বুকে একটা হাহাকার, একটা অভাববোধ রেখে যাবে।

যারা আবার অতটা আশাও রাখেনা কিংবা অতখানি ভাবেও না—তারা চায় শুধু সেই ইতিহাসটুকু জানতে যে, আজ যাদের ভালবাসা, যাদের উৎকণ্ঠাকে আন্তরিক বলে মনে হচ্ছে মৃত্যুর কষ্টিপাথরে তার কতটুকু সেদিন সাঁচ্চা বলে স্বীকৃত হবে। হয়ত পরপার থেকে দেখা যায়, সবই লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এই দেহের অনুভূতিতে তা জানতে না পারলে সুখ নেই। তা ছাড়া কে বলে দেবে পরজীবনে এই মনটা থাকবে কি না, এ জীবন সম্বন্ধে কোন অনুভূতি থাকা সম্ভব কিনা। ঠিক করে জানবার, নিশ্চিন্ত হবার কোনও উপায় নেই। এ সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছে বটে, অনেকে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন কিন্তু যতই জোর করে তাঁরা বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে পরলোক আছে, আত্মা এই অনুভূতি

য়েই সব দেখতে এবং শুনতে পায়—ততই
াত্মপ্রত্যয়ের অভাব ধরা পড়ে গেছে। সব যুক্তি
য় বলে বোধ হয় পাঠকদের কাছে।

আর যদি তা থাকেও, হয়ত আছে, এখন সামান্য
ার জানবার জন্ত, এখানের এই মানুষনামধারী জন্তু ার পর
াবগুলির হাসি-কান্না সুখ-দুঃখে অংশ গ্রহণের জন্ত যতটা ব াবে,
াছে ততটা থাকবে কিনা কে জানে? বিশ্বের আত্মা হয়ত এ ত
াজকের এই আকুলতার জন্ত অপ্রতিভ ভাবে হাসবে। নিজে
:লেমানুষীতে নিজেই লজ্জিত হবে—তবু তাতে আজকে আমার
াবনা কৈ? আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমার এই অস্তিত্ব, আমার
নুভূতি আমার এই আত্মীয়স্বজনের মূল্যই যে সব চেয়ে বেশি।
ই শ্যামা পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আমাকে আজ যে বিভোর
রেছে—এরই সঙ্গে আমার নামটাকে, আমার স্মৃতিকে জড়িয়ে রাখতে
ামি আজ যে তাই এত পাগল!

এসব কথা নিয়ে আর কে কতটা মাথা ঘামায় তা জানিনা
ামাদের দীনু রায় ঘামাতেন। খুব যে বেশি লেখাপড়া জানতেন
া নয়, আই-এস-সি পাস করে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে
াই বিরাট কারখানায় তিনি একদিন চাকরিতে ঢোকেন। আজ
াতদিন পরে বয়লারের ফিটার হিসাবে কাজ করছেন—সে কেবল
ক্কিরির অভাব বলেই, নইলে তাঁর বিশ্বাস আজ তাঁর ফোরম্যান
ওয়া উচিত ছিল। কাজ তিনি ভালই বোঝেন। যাই হোক—
াতে তিনি যে খুব খারাপ আছেন তা নেই। শ'দুই টাকা
াইনে পান, নানারকমের ভাতা জড়িয়ে তা দাঁড়ায় গিয়ে আড়াইশ'

কোম্পানীর কোয়ার্টার আছে, রেশন ব্যবস্থা আছে—দিন মন্দ কাটে না। ছেলেটিকে মানুষ করে তুলেছেন, সে ম্যাট্রিক পাস করে কোন এক কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস ছিল। সম্প্রতি সত্তর টাকা মাইনেতে সেখানেই চাকরি পেয়েছে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে বর্ধমানে, একটু বা ম্যালেরিয়া সেখানে, নইলে জমি-জমা মন্দ নেই ওদের, খুব খারাপ পড়েনি। আর একটি মেয়ে ও একটি ছেলে ইস্কুলে পড়ে। সংসারও খুব ভারি নয়।

সুতরাং দিন ভালই কাটে দীনু রায়ের। আর ভাল কাটে বলেই এই সব কথা ভাববার সময় পান। আমাদের মত উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা থাকলে, সংসার চালাবার জন্য ছুটোছুটি করতে হলে টের পেতেন ব্যাপারটা। অভাব নেই, উদ্বেগ নেই, কালকে র‍্যাশনের টাকা কোথা পাব এ দুশ্চিন্তা নেই বলে যত বাজে কথা ইদানীং মাথায় ঢুকেছিল তাঁর। পাঁচটা সদ্‌গ্রন্থ পড়ার সুযোগ সুবিধা নেই, লাইব্রেরি যদিবা আছে, ভাল নভেল কখনই চাইলে পাওয়া যায় না বলে দীনু রায় সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন। এক-আনাওয়ালা একখানা দৈনিক নেন, সেটা এই মফস্বল শহরে সন্ধ্যে বেলা এসে পৌঁছয়—পরের দিন চা খাবার সময় একবার ওল্টালেই পড়া শেষ হয়ে যায়। চারখানা পাতায় কীই বা খবর থাকে, সব ত বিজ্ঞাপন, রেডিওর প্রোগ্রাম, রেলের টাইম টেব্‌ল্ প্রভৃতিতে ভর্তি।

ফলে বাকি সময়টা চুপচাপ ভাবা ছাড়া কাজ থাকে না। স্ত্রী সংসার এবং রান্না-বাড়া নিয়ে ব্যস্ত। বন্ধু-বান্ধব খুব বেশি নেই, যাও আছে তারাও ব্যস্ত তাদের কাজে ও অকাজে। দীনু রায় এ ক্ষেত্রে করেন কি? যে দিন বেলা দুটোয় ডিউটি শুরু হয় সেদিন তবু বাজারহাট করে, কোয়ার্টারের সামনে একফালি জমিতে একটু

োগান করবার চেষ্টা করে নেয়ে-খেয়ে-ঘুমিয়ে সকালটা কেটে যায়। াত দশটায় চোখের পাতা বুজে আসে। কিছু ভাববার বা বলবার সুযোগ াকে না। যে দিন সকাল ছটায় ডিউটি হয় সেদিনই মুশকিল। াওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে উঠে চা খেয়ে বিকেল পাঁচটায় এক াটিকতক বিড়ি হাতে করে নদীর ধারে গিয়ে বসা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। নির্জন নদীতীর—কারণ এখানে যারা থাকে তাদের নদীর ধারে বেড়াতে যাবার যদি বা সময় থাকে, রুচি থাকে না—সেখানে একা বসে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে একটির পর একটি বিড়ি ধরালে স্বভাবতই মনটা দার্শনিক হয়ে পড়ে এবং জন্ম-মৃত্যু পরকাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

দীনু রায় ইদানীং কথাটা নিয়ে খুব ভাবছিলেন। তবে তাঁর ভাবনাটা ছিল কিছু ভিন্ন ধরণের। সাধারণত পঁয়তাল্লিশ-ছে-চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় লোক যখন পরকালের চিন্তা করে তখন আগেই ভাবে ভগবানের কথা, ভাবে পরলোকে কী জবাব দেব, পরলোক আছে কিনা, যা করছে তাতে কোন পাপ হচ্ছে কিনা, ওদের পাপের সঙ্গে জ্ঞাতিদের পাপের হিসাবটাও ভগবান রাখছেন কিনা, পাপপুণ্য বলে সত্যিই কিছু আছে কিনা—এই সব। বড় জোর তার সঙ্গে বিষয়-আশয়, লাইফ ইন্সিওরেন্সের পলিসি, বাড়ির মর্টগেজ, ভুবিষ্যতের সংস্থান, এসব কথা ভেবে বিমর্ষ হয়।

কিন্তু দীনু রায় ভাবেন অন্য কথা। তিনি নেই, হঠাৎ মারা গেছেন—তখন তাঁর স্ত্রী কি করবে, মেয়ের বেশি শোক লাগবে না ছেলের, ছেলে শ্রাদ্ধের দিন লুকিয়ে চা খেয়ে আসবে কিনা এই সব উদ্ভট চিন্তা তাঁর মাথায় আসে। মরবার প্রসঙ্গ তুললেই তাঁর স্ত্রী তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, 'চুপ! চুপ!

কেন ওই সব অলুক্ষণে কথা? উনি যেন আমার আগে মরবেন! যত জ্যোতিষী আমার হাত দেখেছে সবাই বলেছে যে আমি শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে মরব!'

দীনু রায় হয়ত তবু বলেন, 'আচ্ছা—মিছে করেই ধর না। ধর আমি মলুম, তখন তুমি কি করবে?'

'কী আর করব? খুব বেশি কিছু ত করবার নেই, কেন না তুমি মলে যে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না এটা ঠিক?'

দীনু রায় ভাবেন—কে জানে এটা কতখানি সত্যি। সত্যিই কি তাঁর স্ত্রী এত ভালবাসেন তাঁকে?

কিংবা ভাবেন মেয়ের কথা। বড় মেয়েটি তাঁর বড্ডই প্রিয় ছিল। অফিস থেকে ফিরে তিনি যদি আগে আর কারুর সঙ্গে কথা কইতেন তাহলে তার অভিমানে ঠোঁট ফুলে উঠত। বাবার জামা-কাপড়-জুতোর হিসেব, টাকা কড়ি সবই ছিল তার হাতে। সেই এসে জামা খুলে নিত, জুতোর ফিতা খুলত, স্নানের কাপড় গামছা কলতলায় গুছিয়ে দিয়ে আসত। বিয়ের সময় তার কি কান্না—মাকে ছেড়ে যাবার জন্য নয়, বাপকে ছেড়ে যেতেই তার অত কষ্ট! এখন অবশ্য তার স্বামী, সংসার, ছেলেমেয়ে নিয়ে সে খুবই ব্যস্ত, তবু বাবার জন্য কি তার ভালবাসা এখন আর কিছুই নেই? হয়ত খুবই আঘাত লাগবে তার, নয়ত লোক-দেখান একটু করুন মুখে ভাবতে বসবে মা-ভাইয়ের ত এখন অভাবের সংসার হল—ওর কাছে আবার না কিছু সাহায্য চায়।

ছোট মেয়েটাও কম ন্যাওটো নয়। সেদিন অবধি বুড়ো মেয়ে কোলে চড়েছে। মা মারলেও সে হেসে উড়িয়ে দেয় কিন্তু দীনুবাবু কিছু বললে? বাপরে—একটু উঁচু গলায় কথা বললেই মেয়ের

নসে চোখ ভেসে যায় জলে। অথচ আজ যদি তিনি মারা যান
-তিন দিন পরে হয়ত মালু মনেও করতে পারবে না তাঁকে।

তবু, মনে মনে করেন তিনি, কিছু কি আর শোক লাগবে না?
ার জন্য এতগুলি প্রাণী হাহাকার করে কাঁদবে, স্ত্রী মৃতদেহ ছাড়তে
হবে না, বুকের ওপর পড়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে, যে মেয়ে তাঁর এক
নিট ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না তাকেই এক বিন্দু জল খাওয়াবার
ন্য পাড়া সুদ্ধ-লোক ধস্তাধ্বস্তি করবে—এসব ভাবতে ওঁর খুব ভাল
াগে। তাঁর যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, অন্তত কয়েকটি লোকের
াছে, একথা ভেবে অদ্ভুত একটা গর্ব এবং সুখ অনুভব করেন তিনি।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এসব কথা অনুমান করেই ক্ষান্ত থাকতে
য়। নিশ্চিত করে জানবার উপায় নেই সত্যটা। অনুমানটা যে
কদিন সত্য হবে—এ কথাটা কিছুতে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

মরবার পর কী হবে সেটা মরার আগে জানা সম্ভব নয় অথচ মরার
রে জানা আরও অসম্ভব। হয়ত তাঁর অশরীরী আত্মা সবই প্রত্যক্ষ
রবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু তাই বা তিনি কী করে বুঝলেন? যদি
রলোকের ব্যাপারটা সব গাঁজা হয়? সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্রে
িলোয় তেমনি একটি জীবন হয়ত জীবনের মহাসমুদ্রে মিলোবে একদিন
-তার আর কোন সত্তা, আর কোন অনুভূতিই থাকবে না! তাই কি?

ভাবতেই যেন কেমন বিশ্রী লাগে দীনুবাবুর। এ কৌতূহলটা যেন
াকে দিন দিন পেয়ে বসেছে, এ মেটানো চাই। জানতে হবে তাঁকে
ত্যুর এই অন্ধকার যবনিকা টেনে সরিয়ে জীবনের পরের ইতিহাস—
। জীবন থাকতে জানা সম্ভব নয়। দেহত্যাগের পরের ঘটনা তাঁর এই
জীবন দেহের অনুভূতি দিয়ে জানা চাই, অনুভব করা চাই, নইলে
জীবনের এই বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন হয়ে যাবে তাঁর কাছে।

আচ্ছা, কোন কি উপায় নেই ?

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বিড়িতে শেষ টান দিতে দিতে একটা পথ চোখের সামনে খুলে যায়।

মিছিমিছি করে মরলে কি হয় ? মরবার ভাণ করে যদি আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখা যায় ?

বা-রে এই সহজ কথাটা এতদিন মাথায় আসেনি ? আশ্চর্য।

উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন দীনুবাবু। তখনই কল্পনাটার সমস্ত তথ্যগুলো ভাবতে বসেন। কী করবেন ? বিদেশে গিয়ে কিংবা কলকাতায় গিয়ে অপর কারুর নাম করে একটা টেলিগ্রাম করবেন—'দীনু রায় দুর্ঘটনায় (কিংবা আরও খুলে লেখা যেতে পারে—ট্রাম দুর্ঘটনায় কি বাস চাপা পড়ে) মারা গিয়েছেন এই বলে ? তারপর চুপি চুপি ভোরের ট্রেনে ফিরে এসে লুকিয়ে দেখবেন আড়াল থেকে ?

না, সে বড় হাঙ্গাম। কিছু ব্যয়-বহুলও বটে। কলকাতায় থাকা-খাওয়ার খরচা আছে দু'পিঠের গাড়িভাড়া আছে—কী দরকার বাজে খরচা করার ? তার চেয়ে আর একটা কাজ করলেই ত হয়! আত্মহত্যা করবেন এই বলে একখানা চিঠি লিখে রেখে একদিন যদি অফিসের ফেরৎ আর বাড়ি না আসেন ? তাহলেই ত কান্নাকাটি পড়ে যাবে। বড় মেয়ের ব্যাপারটা চোখে দেখতে পাবেন না বটে—তা সে আর দরকার নেই, এরা যদি 'তার' করে ত ফলাফলের বিস্তৃত বিবরণ জামাইয়ের মুখেই শোনা যাবে। এগুলো ত দেখতে পাবেন।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তেতে ওঠেন দীনু রায়। বিড়ি ফুরিয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণ উঠে পড়ার কথা—কিন্তু নতুন পরিকল্পনার নেশায় এমনই মশগুল হয়ে উঠেছিলেন যে, আজ বিড়ি ছাড়াই বহুক্ষণ বসে রইলেন। মনে মনে সব খুঁটিনাটি তথ্য ভেবে দেখা হয়ে গেল।

শীঘ্রম্‌! কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করা যাবে। ..পরের দুটো দিন দীনুবাবু অত্যন্ত মন-মরা হয়ে রইলেন। কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না, চুপ করে কী যেন ভাবেন সর্বদা। স্ত্রী-কন্যা বার বার খবর নেয়—কিন্তু কোন সদুত্তর পায় না। দ্বিতীয় দিন রাত্রে বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে কী সব লিখলেন—কি লিখছেন, তারও কোন হদিশ্‌ পাওয়া গেলনা জিজ্ঞাসা করে।

পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন বেলা দুটো থেকে ডিউটি। সকালটা সব বাজার-হাট করে দিলেন অনেক করে। হঠাৎ ছেলেমেয়েদের ডেকে খুব আদর করলেন। দু'দিন পরে খুব খুশি খুশি ভাব সেদিন। স্ত্রীকে একবার নির্জনে পেয়ে গাল টিপে দিলেন। স্ত্রী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'মরণ আর কি! বুড়ো বয়সে আবার রস দেখ না!'

মানে—অভিনয়ের কোথাও কোন ত্রুটি না থাকে।

বেরুবার সময় স্ত্রী টিফিনের কৌটোতে জলখাবার গুছিয়ে দিতে এলেন অন্য দিনের মতই—দীনু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আজ থাক—শরীরটা ভাল নেই, বোধ হয় আজ আর খেতে হবে না।' স্ত্রীও খুব পীড়াপীড়ি করলেন না—করবার ত কোন কারণ নেই। কিন্তু দীনুবাবুর সেই হ'ল কাল।

কারখানাতে কাজ করতে করতে খুব ক্ষিদে পেল তা বলা বাহুল্য—কিন্তু কিছু খেতে পারলেন না, জীবনে যে বীতস্পৃহ তার খাওয়াটা ভাল দেখায় না। ভাবলেন, বেরিয়ে কিছু খেয়ে নেবেন। চশমাটা খুলে অফিসে একটা জায়গায় রেখে দিলেন, ওটা তাঁর চাল্‌সে চশমা, ভাল করে কাজের জিনিষ দেখার জন্য। ওটা না থাকলে ক্ষতি নেই, অথচ ফেলে গেলে খুব ভাল 'এফেক্‌ট্‌' হবে।

রাত দশটার পর যখন বেরোলেন তখন দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে এসেছে। যা একটা খোলা দেখলেন তা এত পরিচিত যে কাছে যেতে

সাহস হ'ল না।—অত রাত্রে খাবার কিনে খেয়েছেন শুনলে কি আর আত্মহত্যা কেউ বিশ্বাস করবে? এই একটা ভুল তাঁর হিসেবে থেকে গিয়েছে—ভুল বা ছাড়-বাদ—আগে থাকতে খাদ্যের কোন ব্যবস্থা করেননি।

কী আর করা যাবে! অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ দিয়ে বাসার কাছাকাছি এলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত, অনেক দেরিতে চাঁদ উঠেছে—তখনও ভাল করে আলো হয়নি তাই রক্ষা। কিন্তু কৈ? কান্নার শব্দ কৈ? সব ত চুপ-চাপ! তবে কি, তবে কি চিঠি কেউ পায়নি?

একটা হিম-শৈত্য তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেল। খবরটা পেয়েও সবাই শান্ত হয়ে আছে, চুপ-চাপ? না, তা সম্ভব নয়। চিঠিই পায়নি বোধ হয়। কিন্তু তিনি ত তাকের উপর যেখানে ওঁর স্ত্রীর হাতবাক্স থাকে, সেখানেই রেখে দিয়েছেন চিঠিগুলো কৌটো চাপা দিয়ে। এখনও কি একবারও সেখানে যাবার প্রয়োজন হয়নি তাঁর! কী মুস্কিল! না খেয়ে কতক্ষণ থাকবেন তিনি? আজ এখন শুরু হলে সারারাত ধরে সমস্ত নাটকটা দেখে কাল সকালে দেখা দিতে পারবেন। যদি কাল সকালে শুরু হয় ত—আজ সারারাত কাল সারাদিন! ও বাপ!

পেট যেন খিদেতে মুচড়ে ওঠে। মন খারাপ হয়ে যায় ভীষণ। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের ওপরই রাগ ধরে।

তবু উপায় কি! এখন ফিরে গিয়ে চিঠিগুলো গোপনে সরিয়ে রাখবেন? আবার কাল শুরু করবেন?

সে ইচ্ছা আর হ'ল না দীনুবাবুর। এত আয়োজনের পর—যাক্গে! একদিন উপোস করলে আর কী হবে।

ধীরে ধীরে প্রথম জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সন্তর্পণে শালবনের মধ্য দিয়ে নদীর তীরে গিয়ে বসলেন। একটা ভাল পাথর তাঁর দেখাই ছিল আগে থাকতে—সেখানে গিয়ে কোটটা খুলে রেখে নদীতে নেমে হাতমুখ ধুয়ে এক আঁচলা জলও খেলেন। খালি পেটে জল খেতে ভাল লাগে না, বিশেষত নদীর জল। এখন বর্ষার দিন বেজায় ঘোলা। তবু খুবই পিপাসা পেয়ে গিয়েছিল—গলা ত ভিজতে হবে।

ফিরে এসে পাথরের ওপর বসে বিড়ি ধরালেন। আর যখন কিছু নেই, বিড়িই খাওয়া যাক। একটা, দুটো, তিনটে—কান আছে বাড়ির দিকে। কোন আওয়াজ নেই কোথাও। এই ওদের ভালবাসা? ধিক! এতক্ষণে বারোটা বাজে নিশ্চয়ই, তাঁর ত সাড়ে দশটার মধ্যে ফেরার কথা। একটু খোঁজ-খবর করা উচিত ছিল না?

না—সব নিস্তব্ধ, ওরা বোধ হয় ঘুমচ্ছে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে। তাঁরই শুধু এই দুর্দশা অকারণে, তিনিও যেমন! দুনিয়াটা শুধু পাওনার সম্পর্ক, তাঁর জন্য তাঁকে কে ভালবাসবে! এলেন না এলেন—কেউ খোঁজও করে না। হায় রে দুনিয়া!

চতুর্থ বিড়ি শেষ করে কোটটা মাথায় দিয়ে পাথরটার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। অনাহার, তার ওপর অত পরিশ্রম গেছে সারাদিন—চোখের পাতা যেন টানছে কে ভেতর দিকে। মন্দ নয়, ঘুমোতে পারলে অন্তত খিদের জ্বালাটা ভুলে থাকতে পারবেন।

একেবারে ভোরের দিকে কার একটা তীব্র আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল। কে একজন যেন কাঁদছে একটা গলা পরিষ্কার, আর একটাও হয়ত আছে তার সঙ্গে। একি! এ যে তাঁর স্ত্রীর গলা আর মেয়ের! কী হল ওদের?

অভ্যাস মত দীনুবাবু ছুটছিলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু তন্দ্রা ঘুমটা ভেঙে যেতে সব কথা মনে পড়ল। যাক্—তাহলে ভু হয়েছে। এইবার দেখা যাক্—বাঘের খেলা।

নদীর উঁচু পাড়টার আড়াল দিয়ে দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে, প্রকা যে একটা নালা দিয়ে ওপাড়ার বৃষ্টির জল নেমে আসে নদীতে, তা ভেতর দিয়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে জড়াজড়ি করা একটা খেজু চারা আর শালের চারার আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে বসলেন। এখান থেকে সব বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

আসলে সারারাত ওরা জেগেই বসে ছিল ওঁর অপেক্ষায়। কাকে ডাকবে, কার কার কাছে খবর নেবে ঠিক করতে পারেনি। রাত্রে জ্বালাতন করতে সঙ্কোচেও বেধেছে। তাছাড়া, কারখানায় কিছু কলকজা বিগড়লে রাত কাটিয়ে আসা নতুনও নয়। ভোরের দিকে মেয়ে দেখতে পেয়েছে চিঠির গোছা। একখানা ওর মাকে, একখানা ওকে, একখানা দাদাকে আর একখানা পুলিশ দারোগাকে লেখা। সবাইকেই প্রায় এক কথা—আর পারলুম না। আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার অযোগ্য পিতা বা হতভাগ্য স্বামী ইত্যাদি—শুধু মাকে দু'চার লাইন বেশি লেখা আছে—দুটো সান্ত্বনার কথা—ভালবাসার কথা। আর দারোগাকে লেখা আছে—'আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করলুম। এর জন্য কেউ দায়ী নয়। মৃতদেহ খুব সম্ভব খুঁজে পাবে না, যদি পায় ত যেন নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়—মাছে খাবে। বেঁচে কারুর কোন উপকারে ত এলুম না—যদি মরে আসতে পারি!'

হুলুস্থুল ব্যাপার!

পাড়ার মেয়েরা ছুটে এলেন। পুরুষরা নানারকম জেরা করতে লাগলেন। কী কারণ এমন ঘটতে পারে? ঝগড়া স্ত্রীর সঙ্গে?

অর্থাভাব? দেনা? চরিত্র খারাপ? সাঁওতাল রক্ষিতা ছিল কেউ? মদ খেত? তবে কি?

কৌতূহলটাই বেশি সকলের। ভাখ্—ছুটোছুটি কর্—লোকটাকে খোঁজবার চেষ্টা কর। তা নয়। যেন কারণটা জানতে পারলেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। চেনা গেল সব কেমন বন্ধু। মিছামিছি মরবার এই মজা। খুশি হয়ে উঠলেন দীনুবাবু। যদি বিড়ি একটা খবান যেত শুধু। কিন্তু ভরসা হয় না—ধোঁয়া দেখে যদি ধরে ফেলে?

শেষ পর্যন্ত সবাই চারিদিকে বেরিয়ে গেল। একদল গেল অফিসে সাইকেল করে। একদল নদীর ধারে। কেউ বা থানায় গেল, কেউ বা রেল লাইনের ধার দিয়ে চলল—রেলে মরেছেন কিনা জানতে। এটা ইচ্ছে করেই করেছেন দীনুবাবু, কিসে মরেছেন বা কিভাবে, কাউকে বলেন নি।

মেয়েরা চেষ্টা করতে লাগলেন ওদের সান্ত্বনা দেবার। কিছু খাওয়ানো যায় কিনা সে চেষ্টাও দেখতে লাগলেন কেউ কেউ। 'হুঁ, খাবে বৈকি! আমি মরছি এধারে পেটের জ্বালায়' মনে মনে বলেন দীনুবাবু।

অফিসের দলই আগে ফিরল, সঙ্গে একপাল অফিসের লোক। সব কথাই বেরিয়ে পড়ল—চশমা রেখে এসেছেন, কারুর সঙ্গে দু'দিন ভাল করে কথা কননি, কাল কিছু কিনেও খাননি ওখানে (ভাগ্যিস্!), অফিসের শিশি থেকে খানিকটা 'পটাসিয়াম সায়ানাইড' ঢেলে এনেছেন!

তাই নাকি? চমকে ওঠেন দীনুবাবু।

তাই ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে বটে। নাটকটাকে রসঘন করে তুলতে শেষ মুহূর্তে এই ফন্দিটা মাথায় আসে।

ভুলেই গিয়েছিলেন একেবারে। তা হোক্—কাজটা তা হয়নি।

এখন দেখা দিতে পারলে হত। ব্যাপারটা অল্পের ওপর দিে মিটে যেত। কিন্তু তাতে আসল কথাটাই জানা হবে না যে প্রথম একটা লোক-দেখান শোক ত সকলেরই হয়—কতক্ষণ থাকে সেটাই দেখার কথা। নাঃ, আর একটু কষ্ট করতেই হবে। এর পর আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। সত্যি মরলেও লোক বিশ্বাস করবে না।

নদীতীরের দল ফিরল। তারপর পুলিশ আর হাসপাতালের দল। আরও খানিক পরে রেল লাইনের দল।

কোথাও নেই দীনুবাবু। আর একবার কান্না প্রবল হয়ে উঠল।

দীনুবাবুর একটু অভিমান বোধ হল। খুব খোঁজ করলে ত সব। এই ত তিনি এখানেই জলজ্যান্ত বসে রয়েছেন—আর কেউ খুঁজে পেলে না! হয়ে গেল বাবুদের খোঁজা?

ক্রমে ভাদ্রমাসের খর রোদ মাথায় ওঠে। সামান্য চারাগাছের ছায়া সরে যায়। এখানে আর বসা সম্ভব নয়। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মন বিরক্ত, উদাসীন। দেহও ক্লান্ত। দীনুবাবু উঠে আবার নদীর ধারে গিয়ে বসলেন। রোদে নদীর পাড় ঝাঁ ঝাঁ করছে। তপ্ত বালি থেকে একটা ভাপ উঠছে কেঁপে কেঁপে। চারিদিক স্তব্ধ, শুধু দূরে কোথায় কোন্ ছায়ায় বসে একটা ঘুঘু ডাকছে ঘু-ঘু-ঘু। আর একটানা একটা কান্নার শব্দ। মেয়ে চুপ করে গেছে, আর পারছে না বোধ হয়। শুধু স্ত্রী—তবে তার কণ্ঠও অবসন্ন, ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

এই তাহলে তাঁর দাম।

নদী থেকে আবার এক আঁচলা জল খেয়ে এসে বসলেন দীনুবাবু। একটা বিড়ি ধরালেন। পেটে কী একটা যন্ত্রণা হচ্ছে খালি পেটে জল

খেয়ে। মন বিরক্ত হয়ে উঠেছে স্ত্রীর ওপর বন্ধুদের ওপর, নিজের নির্বুদ্ধিতায়।

এই ত জীবনের দাম। কী হবে মিছিমিছি পরের জন্য ভূতের ব্যাগার খেটে যাওয়ার। আশা নেই, আনন্দ নেই—একঘেয়ে জীবন। খাটছেন কাদের জন্য? মানে হয়ত একটু বাড়তে পারে—তারপর? রিট্যায়ার করে ছেলের গলগ্রহ হওয়া—আর দুঃখ কষ্ট করে দিন চলান। আর একটা মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করতে হবে—ছেলের শিক্ষা বাকি। কটা টাকাই বা পাকেন প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে!

সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করবেন নাকি শেষ পর্যন্ত?

যেটা প্রহসন হচ্ছিল সেটাকে ইচ্ছা করে, নিয়তির নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নিজ হাতে বিয়োগান্ত করে দেবেন?

আর একদল এসেছে আবার নদীর তীর খুঁজতে। লোক কম এদলে—আর কারুর বিশেষ উৎসাহ নেই। শুধু দায়ে পড়ে এসেছে। দীনুবাবু পাথরের আড়ালে একটু গা-ঢাকা দিলেন। ওরা একটু এদিক-ওদিক দেখে চলে গেল অন্যদিকে।

অপরাহ্ণ হয়ে আসে। ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন দেহ শূন্য উদাসীন নদীতীরের দিকে চেয়ে বিবাগী হয়ে ওঠে। কি হবে ফিরে গিয়ে? এই এত কাণ্ডের পর ফিরে কীই বা বলবেন সবাইকে?

স্ত্রী এখনও কাঁদছেন ইনিয়ে বিনিয়ে। এখন যেটা অনুরাগ, বৃথা এত কষ্ট পেয়েছেন জানলে সেটা রাগে পরিণত হবে। হয়ত জীবনে আর ক্ষমা করতে পারবেন না। সবাই অমানুষ ভাববে। ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত মনে মনে ঘৃণা করবে হয়ত। এ কী করলেন মিছিমিছি!

এখান থেকে আর উঠতেও ইচ্ছা করছে না। জীবনে যেন কোথাও কোন আসক্তি নেই। কোন সাধ নেই নতুন করে আবার জীবন শুরু করবার। তার চেয়ে এই ত বেশ।

শুনেছিলেন আত্মহত্যার একটা আকর্ষণ আছে। তাই কি টানছে তাঁকে এমন করে?

হয়ত তাই। কিন্তু চোখ বুজে আসছে ক্লান্তিতে। দরকার নেই। 'পটাসিয়াম সায়ানাইড'-এর কৌটাটা ত পকেটেই আছে। দীনু-বাবু পকেটে হাত দিয়ে একবার চারদিকে চাইলেন। না, বেঁচে থাকবার কোনই কারণ নেই। তার চেয়ে এই ভাল।

ও আবার কারা আসছে না?

তার আগেই কাজ শেষ করতে হবে। কৌটাটা মুখে তুললেন দীনুবাবু।

জীর্ণপত্র

এস্টাব্লিশমেণ্ট সেক্শনের বড়বাবুকে মাত্র দেড়শটি টাকা পান খেতে দিলেই একটা ভাল স্টেশন পাওয়া যেত, তবু সে চেষ্টা না করে আমাদের ভবতোষবাবু এখানেই বদলী হয়ে এলেন, তার কারণটা এমন কি তাঁর স্ত্রীর কাছেও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু আমরা জানি। আমরা জানি যে এটা তাঁর দেশ নয়—মামার বাড়িও নয়, শ্বশুর-বাড়ি তো নয়ই, তবু স্থানটির সঙ্গে তাঁর জীবনের তিনটি স্মরণীয় বৎসর মিলিয়ে এক বিচিত্র ইতিহাস রচিত হয়ে আছে।

তাঁর বাবা যে কাজ করতেন তাতে তাঁর কোন এক স্থানেই বেশী দিন থাকবার উপায় ছিল না। দিনে রাতের কোন একটা নির্দিষ্ট সময় বাড়িতে থেকে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উপর নজর রাখবেন এ সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং শিক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে তিনি মামার বাড়িতে মামার জিম্মাতেই রেখে গিয়েছিলেন। মামা কাজ করতেন পোষ্ট অফিসে। সদরেই চিরদিন কাজ করে এসেছেন। সেইখানেই কাজ শেষে বিদায় নেবেন এই কথাই সবাই জানত, কিন্তু হঠাৎ বোধ হয় ভবতোষের অদৃষ্ট ক্রমে এইখানের সাব পোষ্ট অফিসের মাষ্টার হয়ে চলে এলেন ভদ্রলোক বছর চারেকের জন্য। তখন ভবতোষবাবু সবে থার্ড ক্লাসে উঠেছেন (এখনকার সেটা ক্লাস এইট্), সেখান থেকে ফার্ষ্ট ক্লাস পর্যন্ত অগত্যা তাঁকে এখানের ইস্কুলেই পড়তে হয়। পরীক্ষাও তিনি এখান থেকেই দেন। কোন মতে পাসও করেছিলেন। তারপর আর পড়া সম্ভব হয়নি। জীবনের রথচক্র তাঁর ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে রেলের অফিসে এসে ঢোকে এবং কিছু নীচু স্তরের ষ্টেশন মাষ্টারীতে পৌঁছে দেয়। এখনও তিনি সেইখানেই থেমে আছেন—বলা বাহুল্য।

আজ তিনি পাকা রেলের লোক। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। মাথার সামনে টাক পড়েছে। অনেকগুলি ছেলেপুলে, ঈষৎ নেয়াপাতি ধরণের ভুঁড়িও ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। কি ভাবে ঘুষ আদায় করতে হয়, কেমন করে কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে হয়, বিনা টিকিটের যাত্রীদের ধরে রসিদ না দিয়েও কি করে ডবল ভাড়া আদায় করে নিতে হয় এসব রহস্য তাঁর নখদর্পণে। বেপারীদের কাছ থেকে আনাজ ডিম দুধ প্রভৃতি সকলের চেয়ে বেশী তিনিই আদায় করতে পারেন। এমন কি পুরানো ঘাঘী ষ্টেশনমাষ্টাররাও তাঁর কাছে হার

মানেন এসব ব্যাপারে। তাঁর প্রতিভা সর্বতোমুখী। বোধ হয় কোন জিনিষই তাঁকে কিনে খেতে হয় না। দুর্মুখ বলে যেমন কুখ্যাতি আছে, তেমনি কোন কোন স্থলে তোষামোদের মধু-বর্ষণেও তিনি অদ্বিতীয়। ঘোরতর বিষয়ী ও আসক্ত জীব—ছেলেমেয়ে স্ত্রী চাকুরি নিয়ে বিব্রত আছেন বললে বোধ হয় সত্যের একটু অপলাপ করাই হবে—ডুবে আছেন।

এ হেন ভবতোষবাবু অনায়াসে যখন ভাল ষ্টেশনে (অর্থাৎ যে ষ্টেশনে উপরি রোজগার বেশী, যেখান থেকে মাল যাতায়াত করে) যেতে পারতেন, তখন এখানে এলেন কেন ?

এ জবাব ভবতোষবাবুর পক্ষেও গুছিয়ে দেওয়া শক্ত বৈ কি।

বোধহয় হৃদয়তত্ত্বের এ রহস্য অনেকের কাছেই দুর্জ্ঞেয়।

মানুষের মনের মধ্যে ছাপ পড়বার বয়স হল তেরো থেকে কুড়ি। তার আগে থাকে বড় বেশী তরল—তারপরে হয়ে যায় বড় বেশী কঠিন। তখন প্রবল আঘাত বা কঠিন ছেনি ছাড়া কোন দাগ পড়া সম্ভব নয়। সেই ভাবাবেগপূর্ণ—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ইম্প্রেসনেবল্'—বয়সের সবচেয়ে রঙীন এবং মধুর কটি বৎসর ভবতোষবাবুর কেটেছে এই খানেই। অবশ্য এই ধরণের কোন হৃদয়াবেগ ভবতোষবাবুর মত লোকের থাকা সম্ভব কিনা এ নিয়ে মনস্তাত্বিকরা তর্ক তুলতে পারেন। এমন কি কথাটা স্বয়ং ভবতোষবাবুকে বলতে গেলে তিনিও চমকে উঠবেন। হয়ত কথাটার অর্থই বুঝতে পারবেন না। তবু ঘটনাটা যা ঘটেছিল তাই বলছি।

এই ষ্টেশনের নামটা পেতে প্রথমে ভবতোষবাবু জলে উঠেছিলেন। কতকগুলি অলেখ্য গালাগালি সহযোগে বড়বাবুর মুণ্ডপাত করতে করতে তখনি প্রতিকারের জন্য তদ্বির করতে উদ্যত হয়েছিলেন

এটাও ঠিক—কিন্তু পরে দুপুর বেলা স্নানাহারের অবসরে অন্যমনস্ক-ভাবে স্থানটার কথা ভাবতে ভাবতে সেই পুরাতন স্বপ্নময় দিনগুলির স্মৃতি এমন ভাবেই তাঁকে উন্মনা করে দিল যে আর একবার সে জায়গাটা দেখবার এবং সেখানে যাবার ইচ্ছা কোনমতেই তিনি দমন করতে পারলেন না। স্ত্রীকে, বন্ধুবান্ধবদের এবং নিজের মনকেও বোঝালেন যে প্রত্যেকবার বদলীর নাম হলেই তিনি তদ্বির করে যদি তা নাকচ্ করিয়ে নেন্ তাহলে লোকেই বা বলে কি? তার চেয়ে বছরখানেক চোখ-কান বুজে কাটিয়ে দেওয়া যাক, তারপর আবার একটা সুব্যবস্থা করে নিলেই চলবে। আর্থিক লোকসান কিছু হবে বটে, তবে ঐ ষ্টেশনটা দিয়ে এত মাছ আর ডিম যাতায়াত করে যে খাওয়ার সুখ পাওয়া যাবে অনেকখানি।

অগত্যা একদিন মালপত্র, কুঁচোকাঁচা ছেলেমেয়ে এবং বিছানা-মাদুর নিয়ে ভবতোষবাবু এখানে এসে পৌঁছলেন। ষ্টেশনের পাশেই দু-কামরার কোয়ার্টার, ফুটোর মত ছোট ছোট জানলা-ওয়ালা ঘর এবং তিনটে কোয়ার্টারের জন্য একটি মাত্র কুয়া—রেলের কোয়ার্টার যেমন হয় তেমনিই—প্রায় আলোবাতাসহীন শুয়ারের গর্ত!

তারপর সেই পুরাতন জীবনযাত্রারই পুনরাবৃত্তি। চ্যাঁ-ভ্যাঁ সর্দি জ্বর, পেটের অসুখ ছেলে-মেয়েদের, স্ত্রীর বকাবকি—স্টেশনে গিয়ে টিকিটের হিসেব লেখা, ক্যাশ মিলানো—ক্যাশের থলিতে কোন অচল টাকা বা নোট না যায় সেজন্য সতর্কতা (কারণ তাহলেই ক্যাশের বাবুরা সেই টাকাটিকে দুখানা করে কেটে দিয়ে ফেরৎ পাঠাবেন, গচ্চা যাবে তাঁরই), দুধ ডিম মাছ আদায়ের জন্য লোলুপ ও উগ্র দৃষ্টি সজাগ রাখা—যেমন অন্য স্টেশনে দিন কাটে তেমনিই গতানুগতিকতার ঠাস্‌বুনানি করা নিরন্ধ্র জীবন।

অবশেষে একদিন অবসর মেলে।

কাজটা বিকালের দিকে কম, অ্যাসিস্ট্যান্ট বুকিং ক্লার্ককে বসিয়ে ভবতোষবাবু স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়েন।

সব যেন নতুন নতুন লাগে। অবশ্য পুরাতন গ্রামের চিহ্ন আছে বৈকি। রায়েদের পুরোনো শিব মন্দিরটা আর একটু ভেঙে গেছে। ত্রিগুণা বুড়ীর চালা ঘরটা সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকে পড়েছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে আজও। বৈদ্যনাথবাবুর ছেলেরা আজও খাবারের দোকানটা চালাচ্ছে তাহলে! ঐ ত মুখুজ্জেদের বাড়ী, সামনে দুখানা নতুন ঘর উঠিয়েছে বোধ হয় ওদেরই কোন শরীক, তাই ঠিক চেনবার উপায় নেই, মোদ্দা আসল বাড়ীটা ওর পেছনে তেমনিই আছে!

তবু পরিবর্তনও হয়েছে ঢের। স্টেশনের ধারে তিন তিনটে চায়ের দোকান হয়েছে নতুন। আবার চপ-কাটলেট ভাজছে। তখন এসব খাবারের নাম শোনেনি এখানে। মনিহারির দোকান হয়েছে কতকগুলো। ও হরি, আবার জুতোর দোকান। জুতোর দোকানেরই একটা শো কেসে চারটি ঝকচকে বাংলা বই বিয়েতে উপহার দেবার মত। আগে দেড়টাকা হলে একটি ভাল সিঁদুরকৌটা হত, বিয়েতে তারই চল্ ছিল খুব। এখন পাঁচ-ছ' টাকার কম সিঁদুর কৌটা পাবার উপায় নেই। তার চেয়ে বই ঢের সস্তা, সব জায়গাতেই তাই বিয়ের উপহারে বই চলেছে।

ভবতোষবাবু চায়ের দোকানের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন যদি কোন চেনা মুখ চোখে পড়ে এই আশায়, কিন্তু তাঁর পরিচিত কেউ নেই। এরা আজকালকার ছেলে, হয়ত এদের মধ্যে তাঁর বন্ধুদের ছেলেপুলে থাকতে পারে। চায়ের দোকানে আড্ডা দেয় চিরকাল ছোকরারাই, আজও তাই দিচ্ছে। তবে তাঁদের সময় এমন প্রকাশ্যে

রাস্তার ধারে বসে বিড়ি বা সিগারেট টানার রেওয়াজ ছিল না। তাছাড়া পনের-ষোল বছর বয়সে সিগারেট খেতেও শেখেন নি তাঁরা। ইস্কুল ছাড়বার অনেক পরে লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধটা। চাকরীতে ঢোকার পর নেশাটা পেকেছে। তবু তাঁদের ছেলেবেলায় এরকম স্বাস্থ্য ছিল না তাঁর কোন বন্ধুবান্ধবের। এই যে পনেরো ষোল বছরের ছেলেটি চায়ের পেয়ালা হাতে ধরে কায়দা করে সিগারেট খাচ্ছে হয়ত ফণির ছেলে হবে (বামুনদের ফণি তাঁদের ক্লাসের সব চেয়ে বোকা ছেলে ছিল—মুখের আদল অনেকটা ফণির মতই) ওর মত রোগা তিনি সে সময়ে কাউকেই দেখেননি। বুকের পাঁজর প্রত্যেকটি গোনা যায়, হাতপা কাঠিকাঠি—কী ভরসায় এই বয়স থেকে তামাক ধরেছে, আশ্চর্য! তাঁরা সে সময় যাদের 'এক ছটাকী কাঁপা' বলে ঠাট্টা করতেন তাদের বুকও এর চেয়ে ঢের চওড়া ছিল।

ভবতোষবাবু এগিয়ে যান ছেলেটির দিকে, 'হ্যাঁ ভাই, ফণি চক্রবর্তী থাকত এই দিকে, কোথায় জানো?'

সিগারেটটা জ্বলতেই থাকে হাতে, ছেলেটি ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে, 'ফণি চক্রবর্তী? কোন্ ফণি চক্রবর্তী? দক্ষিণ পাড়ার? আমার এক কাকা আছেন ঐ নামে, তিনি এখনও বেঁচে আছেন, চাকরী করেন বেগ ডানলপে!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দক্ষিণ পাড়াই বটে। কালো, রোগা-মত? তিনি তোমার কাকা? তুমি তাহ'লে নবীনদার ছেলে? তোমার নাম কি?'

এইবার সিগারেটটা হাতের উল্টো দিকে আশ্চর্য কৌশলে চলে যায়। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমার নাম শচীন, শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আপনি আমার বাবাকে চেনেন?'

'চিনি বৈকি! ফণি আর আমি এক ক্লাসে পড়তুম।'

একটা যেন প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় তাঁর কথাটা বলবার সময়। ছেলেটা একটুখানি অপ্রস্তুত হয়েছে বৈকি! কিন্তু বলিহারি সাহস, আধ-বুড়ো লোকের সঙ্গে কথা কইছে, সিগারেটটা লুকোতেও মনে থাকে না! তবু ভালো যে শেষ পর্যন্ত সেটা পেছনে গেল!

সেখান থেকে বেরিয়ে রায়পাড়ার মোড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। সেই প্রকাণ্ড আম গাছটা আজও আছে! তখনই ওটাতে আর ফল হত না, এখন ত নিশ্চয়ই হয় না। তবু কাটে নি কেন? এটা নাপিতদের বাড়ী ছিল, বুড়ো চণ্ডী নাপিত হয়ত মরে গেছে—এখন কে থাকে কে জানে বাড়ীটাতে। এই গাছে তাঁরা দোলনা খাটিয়ে দোল খেতেন ফার্স্ট ক্লাসে পড়বার সময়। তিনি আর পীযুষ।

সত্যি, পীযুষ এখন কোথায় আছে কে জানে। শুনেছিলেন সে নাকি ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তে কোথায় পালিয়ে যায়—আর বাড়ী ফেরেনি। বাড়ীতে মা ছিল না, সৎমা—হয়ত সেই দুঃখেই তার অমন মতিগতি হয়েছিল। সৎমাকে পীযুষ কখনই দেখতে পারত না, ওর কেমন একটা ধারণা ছিল যে তার বাবার স্নেহ তার সৎমা চুরি করে নিয়েছেন।

পীযুষের সঙ্গেই তার ভাবটা ছিল সবচেয়ে বেশী। পীযুষ আর গৌর। সমস্ত সেকেণ্ড ক্লাস আর ফার্স্ট ক্লাসটা তাঁরা তিনজনে এক বেঞ্চে বসে কাটিয়েছেন। কখনও কেউ অন্য কোথাও যেতে চাইত না। অথচ গৌরের কথাটা তাঁর মনেই ছিল না, এইমাত্র মনে পড়ল, বোধহয় সতেরো-আঠারো বছর পরে। গৌর জব্বলপুরে না জামসেদপুরে কোথায় চাকুরী করে এইটুকু তাঁর মনে আছে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা, বহুদিন আগে কে যেন তাঁকে বলেছিল।...

রায়েদের মাঠটা খানিকটা বোধহয় বিক্রী হয়ে গেছে, নতুন নতুন সব বাড়ী উঠেছে এদিকে। তবু তারই পাশ দিয়ে তাঁদের সেই ইস্কুল যাবার পায়ে-চলা পথটা এখনও আছে। তাঁরা কেউ তখন বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতেন না। এইটেই ছিল ইস্কুল যাবার রাস্তা।

ভবতোষবাবু কতকটা অন্যমনস্কভাবেই সেই রাস্তাটা ধরেন। অভ্যস্ত পা যেন আপনা থেকেই এগিয়ে যায়। পঁচিশ বছর আগের অভ্যাস, তবু পা সে ইতিহাস ভোলেনি।

ইস্কুল নাকি এখন আরও একটা হয়েছে। একটা মেয়েদের ইস্কুলও ও পাড়ায় কোথায় হয়েছে, কিন্তু সে সব ইস্কুলের কথা ভাবতে ভাল লাগে না ভবতোষবাবুর। বরং তিনি যেন মনে মনে একটা বিদ্বেষ অনুভব করেন ওদের সম্বন্ধে। ওরা যেন অবাঞ্ছিত ভাবে এসে তাঁদের সেই ছেলেবেলাকার ইস্কুলের মর্যাদা নষ্ট করতে চায়। ওঁদের সেই ইস্কুলই ভাল। নিস্তারিণী গদাধর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় তার সেই নোনাধরা বালি-খসা দেওয়াল এবং ভেঙ্গে-পড়া পাকা ফটক নিয়ে তাঁদের মনের মধ্যে অক্ষয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে।

একেবারে ফটকের সামনে এসে ভবতোষবাবুর চমক ভাঙে। আরে, তিনি যে ইস্কুলেই এসে পড়েছেন দেখছি। ফটকটা তেমনিই আছে এখনও, হয়ত আরও গোটা-কতক ইট ডান দিকের থামটা থেকে খসে পড়েছে। বাড়ীঘর এখনও তেমনি আছে, তার মধ্যে হয়ত বছর দশ-বারো পূর্বে একবার চুণবালি ধরানো হয়েছিল। আর পরিবর্তনের মধ্যে সেই ডালিম গাছটা কেটে সেই জায়গায় ছুটো করগেট টিনের চালা বসানো হয়েছে। নতুন কোন সেক্‌সান বসে সেখানে। ভবতোষবাবু ভারি একটা তৃপ্তি অনুভব করেন মনের মধ্যে, নতুন

ইস্কুল হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এই ইস্কুলটাই ভাল চলেছে—ছাত্র বেড়েছে।...

ছুটি হয়ে গিয়েছে তখন ইস্কুলের, তবু একটা দুটো ছেলে হয় কোচিং ক্লাস করছিল, নয়ত এমনই কোথাও আড্ডা দিচ্ছিল, এখন তারা বাড়ী ফিরছে। ফার্স্ট ক্লাসের ছেলে বলেই মনে হয়, বয়সে বড়, কেউ কেউ ইতিমধ্যে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেছে, রোগা রোগা অসুস্থ ছেলে সব—দেহে ও মনে অসুস্থ এরা, কেমন একটা চাইবার ভঙ্গী, বিশ্রী রকমের। তাঁরা নিশ্চয়ই এমন ছিলেন না সে সময়ে, মনের মধ্যে জোর দিয়ে বলেন ভবতোষবাবু।

রেলের কোট পরা প্রৌঢ় ভবতোষবাবুকে এমন সময়ে ইস্কুলের ফটকের মধ্যে ঢুকতে দেখে ছেলেরা বিস্মিতভাবে চায়। একজন একবার থমকে দাঁড়ালও, বোধহয় ভবতোষবাবু কিছু প্রশ্ন করবেন এই আশাতে; কিন্তু ভবতোষবাবু যখন কোন কথা না বলে বাড়ীর ভেতর দিকে চলে গেলেন তখন অগত্যা তাঁদের কৌতূহলটা না মিটিয়েই চলে যেতে হয়। নিজেদের মধ্যে আপোসে ফিস্ ফিস্ করতে করতে চলে যায় ওরা—ওদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ভবতোষবাবুর ভারী মজা লাগে। ঐ বয়সে তাঁদের এক্ষেত্রে কী মনে হতে পারত সেইটে ভেবে ওদের মনোভাবটাও কল্পনা করতে পারেন। আপন মনেই হেসে ওঠেন ভবতোষবাবু।

সেই ও-পাশের পেয়ারা গাছটার দিকের শেষ ঘরখানা তখন ছিল ফার্স্ট ক্লাস। এই ঘরটা সম্বন্ধেই কৌতূহল এবং আগ্রহ যেন বেশী। সেকেণ্ড ক্লাসটার কথা বিশেষ মনে নেই। হ্যাঁ—এই যে এখনও তাই আছে, 'ক্লাস টেন-এ' টিনের ছোট্ট একটা প্লেটমারা দরজার ফ্রেমের ওপর—

তাঁরা যে বছর ফার্স্ট ক্লাসে ওঠেন সেই বছরই সবে এ ঘরের নতুন বেঞ্চ এবং হাইবেঞ্চ এল। ডেস্কের মত বই রাখবার জায়গা শুদ্ধ, নতুন ধরণের হাইবেঞ্চ। ওঃ, ওঁদের কী আনন্দ তাতে, আর বাকী সকলের কী ঈর্ষা! যারা সবে পরীক্ষা দিয়েছে সে বছর, তাদেরও অনেকে ভীড় করে দেখতে এল সেই বেঞ্চিগুলো। চক্চকে সম্ভ পালিশ করা নতুন কাঠের গন্ধযুক্ত সে বেঞ্চিগুলোর কথা এখনও মনে আছে তাঁর—অসংখ্য ছুরির ঘা-খাওয়া এবং নামলেখায় ক্ষতবিক্ষত বেঞ্চি নয়, মসৃণ চকচকে—ভবতোষবাবুরা হাত বুলিয়ে গাল রেখে অনুভব করতেন তাদের মসৃণতা।

সেইগুলোই আছে কি এখনও? না বদলানো হয়েছে আবার?

ক্লাস ঘরের দোর এখনও খোলা। চাকর বোধহয় কোথাও গেছে, এসে বন্ধ করবে। ভবতোষবাবু পা-পা করে সামনে গিয়ে দাঁড়ান। কেমন একটা ভয় ভয় করে ওঁর, যদি সে বেঞ্চিগুলো না থাকে?

না, ঐ ত আছে। ঠিক সেইগুলোই। বার্নিশ আর নেই। পেন্সিল-কাটা ছুরির আঘাতে এবং অসংখ্য ছেলের নাম লেখার চেষ্টায় ওদের সর্বাঙ্গ ক্ষতলাঞ্ছিত, তবু চিনতে পারেন ভবতোষবাবু। এই-গুলোই বটে।

ঐ জানালার ধারের বেঞ্চিটাতে তাঁরা বসতেন—তিনি, পীযুষ আর গৌর।

এখনও কি তাঁদের নামগুলো আছে? পড়া যাবে, এই অসংখ্য নামের অরণ্যের মধ্যে থেকে তাঁদের নামগুলো কি বেছে নেওয়া যাবে?.... তাঁরাই প্রথম নাম ক্ষোদাই করেছিলেন এই হাইবেঞ্চের গায়ে। গৌরটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে ওঁদের নামের আদ্য অক্ষরগুলো ক্ষোদাই করেছিল মনে আছে।

'দেখি দেখি!' প্রায় দৌড়েই চলে যান ভবতোষবাবু ওধারে।

হ্যা—এই ত। চিনে নিতে কষ্ট হয় বটে, তবু দেখতে পান ভবতোষবাবু ঠিকই—পি-কে-এস, বি-বি আর জি-সি-সি। পীযূষকান্তি সরকার, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য এবং গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আশ্চর্য্য। সেই নামগুলো এখনও আছে এখানে?

অভিভূতের মত সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ভবতোষবাবু। হঠাৎ যেন তাঁর জীবনটা পঁচিশ বছরের সমুদ্রে সাঁতার কেটে চলে যায় তাঁর কৈশোরের তীরে। তখনকার সেই সুখদুঃখ, আনন্দ বেদনা, এখনকার দিনে মূল্যহীন, অথচ তখনকার দিনের গভীর অনুভূতি সব যেন ভীড় করে এসে দাঁড়ায় তাঁর স্মৃতির দরজায়। কপালের শিরা টন্ টন্ করতে থাকে ওঁর কী এক উত্তেজনায়। যেন কান্না পাবার আগের অবস্থা। চোখে জল আসবে নাকি তাঁর?

কী জীবনই ছিল তখন!

কী সব ছোট খাটো কথা নিয়ে কি উত্তেজনা তখন, কী তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কত আনন্দ। আজ জীবন তার সহস্র সঞ্চয় জড়ো করেছে সত্য কথা। স্ত্রী পুত্র কন্যা টাকা পয়সা আসবাব বিলাস ও সুখের অজস্র আয়োজন। তবু, মনে হয় আজ জীবনে কোথাও কোন সুখ কোন আনন্দ নেই। মন যেন নিরুদ্ধ বাতাসে হাঁপিয়ে ওঠে।

পি কে এস। অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে সত্যাই ভবতোষবাবুর চোখ জ্বালা করে ওঠে।

অদ্ভুত ছেলে ছিল পীযূষ, ভারি অভিমানী আর চাপা, অথচ একটা মেয়েলি ধরণের কোমলতা ছিল ওর দেহে এবং মনে। বেড়ালে চড়াই পাখীর ছানা নিয়ে যাচ্ছে দেখলে চোখে জল আসত, কিন্তু বিমাতার ওপর অভিমান করে দুদিন না খেয়ে থাকলেও কেউ সে কথা টের

গতন। ওর মুখ চেয়ে। ভবতোষবাবুর সঙ্গেই তার ভাব ছিল সবাকার বেশী। মনের কথা একমাত্র তাঁকেই বলত সে; মধুর আন্তরিকতায় তাদের সম্পর্কটা সাধারণ সহপাঠীর চেয়ে ছিল ঢের বেশী নিবিড়। মনে আছে সন্ধ্যাবেলা একত্রে বেড়িয়ে ফেরবার পথে ঝিলের ধারে যখন দুজনের ছাড়াছাড়ি হত অর্থাৎ দুজনেই নিজেদের বাড়ীর রাস্তা ধরতেন তখন বিচিত্র একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর। কোথা থেকে একথাটা তাঁর প্রথম মনে আসে তা তিনি জানেন না, কী করে এ প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি—বোধহয় কী একটা সহজাত সংস্কার তাঁকে আপনা থেকেই এ অভ্যাস ধরিয়েছিল—তিনি প্রত্যহ একটি করে চুমো খেতেন পীযূষকে। অদ্ভুত অর্থহীন একটা আদর—আজো মনে হলে নিজেরই লজ্জা করে, অথচ পীযূষের কাছে সেটার মূল্য যে কতখানি ছিল তা তিনি টের পান সেইদিন, যেদিন অন্য একটা কাজের তাড়ায় ও কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। পরের দিন পীযূষ অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা কয়নি, ছল-ছল ম্লান মুখে বসেছিল সারাক্ষণ। অনেক পীড়াপীড়ি অনেক সাধ্য-সাধনার পর অভিমানের কারণটা তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল।

'কে, কে ওখানে?'

ভাঙ্গা ভাঙ্গা কর্কশ গলায় কে প্রশ্ন করে ওঠে।

চমকে ওঠেন ভবতোষবাবু। তাঁর যেন কতদিনের একটা ঘুম ভেঙ্গে যায়। আরে এ যে দেবেন, ইস্কুলের চাকর দেবেন, তখন ছিল যুবক, বুড়ো চাকর পিয়ারীর ছেলে সে, এখন তারই মাথার চুল গোঁফ এমন কি ভুরু পর্য্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

দেবেন বোধহয় বাজারে গিয়েছিল, বাজার হাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কি দেবেন, চিন্‌তে পারছনা আমাকে?'

'চিনতে?' বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে দেবেন, 'এদিকে আলোতে মুখটা ফেরাও দিকি, ঠাওর পাই কিনা—'

তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভ্রু কুঁচকে চেয়েও চিনতে পারে না।

ভবতোষবাবু মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, 'আমি ভবতোষ; সেই উনিশ শ' চল্লিশ সালে পাস করে বেরিয়ে যাই। মনে নেই? এই বেঞ্চিগুলো যে বছর প্রথম এল?'

'তা হবে।' অনেকক্ষণ ধরে মনে করবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেন দেবেন, 'অনেকদিনের কথা হলো, এখন মনে পড়ে না সব। চোখেও ভাল দেখি না। তা এখন কি করছ?'

একটু ক্ষুণ্ণই হন ভবতোষবাবু। 'এখনও চিনতে পারলেনা আমাকে? সেই একবার সরস্বতী পূজার সময় কপি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলুম—তুমি আমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলে? মনে নেই?'

'হ্যা—হ্যা, একটু একটু যেন মনে পড়েছে। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। এখানে কবে এলে?'

খুশীতে গলে যান ভবতোষবাবু 'এসেছি মাসখানেক হল। এখানে ইষ্টিশনের ছোট বাবু এখন। একদিন যেও, চারটি মাছ দেব।'

'যাবো। যাবো।'

এইবার দেবেনও খুশী হয়।

'পুরোনো মাষ্টার মশাইরা কে কে আছেন দেবেন?'

'পুরোনো? প্রফুল্লবাবু, শচীবাবু, সন্তোষবাবু, শক্তিবাবু—'

'শক্তিবাবু এখনও আছেন? বেঁচে আছেন তিনি?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেন ভবতোষবাবু।

'ছিলেন বৈ কি! বোধ হয় এখনও ঐ ঘরেই আছেন আজ। ক্লাচিং ক্লাস করছিলেন বলে আমি বাজারে গিইছিলাম। ছাখো দেখি ঐ ঘরটা—'

আশ্চর্য! শক্তিবাবু আজও আছেন!

ভবতোষবাবুরা যখন পড়েছেন তখনই শক্তিবাবুর চুল অর্দ্ধেক পেকে গেছে। এ ইস্কুলের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি আছেন। গ্রামের জমিদার, যাঁর বাবা মার নামে এই ইস্কুল, তাঁরই বন্ধু শক্তিবাবু। কতকটা ওঁর চেষ্টাতেই তাঁর হাত থেকে টাকা বেরোয় এবং ইস্কুল হয়। বি. এ ফেল, তবু জমিদার এমন ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন যে শক্তি বাবুকে কোন দিন এ ইস্কুল থেকে তাড়ানো চলবে না। তখনও তিনি ওদের ক্লাসে অঙ্ক কষাতেন বোধহয় আজও কষান।

ভবতোষবাবু দেবেনের আঙুল অনুসরণ করে তাড়াতাড়ি বাঁদিকের দ্বিতীয় ঘরখানার দিকে গেলেন—এটা তখন থার্ড ক্লাস ছিল, আজও তাই আছে দেখছি। সত্যিই ত, ঐ ত শক্তিবাবু। একটা বেঞ্চিতে বসে পেছনের হাইবেঞ্চ ঠেস্ দিয়ে ঝিমুচ্ছেন। মাথাটা সব পেকে গেছে, সাদা-ধপধপে, মুখের চামড়া একটু বেশী কুঁচকেছে, তবু বেশ চেনা।—যায় চেহারার এমন কোন পরিবর্তন হয়নি। চশমা সেই রকম নাকের ডগায় ঝুলে আছে, তখনও এমনই থাকত। সেই নিকেলের ফ্রেম! এখন শুধু এক দিকের ডাঁটির বদলে সুতো বাঁধা।

ওঁর পায়ের শব্দে শক্তিবাবু চোখ মেলে তাকালেন। ঘোলাটে বিহ্বল দৃষ্টি, কেমন একটা অসহায় ভাব মুখের। ভবতোষবাবু তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রশ্ন করেন, 'চিনতে পারাছেন স্যার?'

'চিনতে? কৈ দেখি?—'

অনেকক্ষণ ধরে ঘাড়টা পেছনে কাৎ করে চশমার ভেতর দিয়ে চেয়ে রইলেন শক্তিবাবু। তারপর সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কে গাড়ু না?' আনন্দে ভবতোষ বাবু যেন সত্য-সত্যই বাল্যকালে ফিরে গেলেন। এ নামটা যে তিনিই ভুলে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় একটু বেশী কথা কইতেন বলে শক্তিবাবুই এই নাম তাঁকে দেন—গাড়ু।

'এখনও মনে আছে স্যার?'

'মনে থাকবে না। বিলক্ষণ। এ তু সে দিনের কথা—তোদের দশবছর আগে যারা গেছে তাদেরও মনে আছে। তারপর? কেমন আছিস? কি করছিস?'

'ভাল আছি স্যার, চাকরি করছি রেলে—এখন এই ইষ্টিশানেই আছি।'

বেশ বেশ! ছেলেপুলে সব ভাল? কটা ছেলে? দে না এই খানেই ভর্তি করে।'

'তাই দেব ভাবছি। কিন্তু আপনি এখনও এখানে মাষ্টারী করছেন, আশ্চর্য!'

'কি করব বাবা। পাঁচ পাঁচটা মেয়ে পার করতে হয়েছে, মাষ্টারী করে আর কত পয়সা জমিয়েছি বল্? ভিটেটা সুদ্ধ বাঁধা। তার উপর বড় ছেলেটা ডাক্তারী পাস করলে, ভাল চাক্রীও পেলে—তিন মাসের মধ্যেই টি-বি ধরল। সে উল্‌টে ঘর থেকে আরও চারটি গেল, বিধবা বৌটা চাপল ঘাড়ে। মেজো ছেলেটা বি-এস-সি পরীক্ষা দেওয়ার পরই টাইফয়েড আর ডবল নিমোনিয়ায় শেষ। চাকরী ছাড়লে খাবো কি বল্? এখন ওই শিবরাত্রির সল্‌তে ছোট ছেলেটা আই-এ পড়ছে। ও যদি বাঁচে কাজকর্ম পায় তবেই ভরসা।'

একটা শুধু ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাক্তবাবু চুপ করলেন। এ কি াস্তি ভগবানের মনে মনে ভাবেন ভবতোষবাবু। বৃদ্ধ ইস্কুলমাষ্টারের ীবনে এ কি অভিশাপ !

শক্তিবাবু কিন্তু শোকে বা দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন না। বরং সহজকণ্ঠেই লে চলেন, 'তার ওপর এই বাজার, মাইনে আজও আশি টাকা, বাইশ াকা পাই মাগ্‌গি ভাতা—কি হয় তাতে বল ? তবু আজকাল এই কাচিং ক্লাসটা খুলেছি, মাস গেলে গোটা কুড়ি চব্বিশ আসে। সাত াতটা লোক খেতে, লেখা পড়ার খরচা আছে, কাপড় জামা আছে, দনার সুদ আছে। মাছ আর দুধ কী জিনিষ তাই ভুলে গেছি। াফিং-এর মুখে একটু মিষ্টি চা. তাই জোটে না।'

শক্তিবাবু আবার চুপ করলেন।

ভবতোষবাবুর চোখ ছলছলিয়ে এসেছিল। গত কুড়ি বছরের মধ্যে াান বিচলিত বোধ হয় কখনও হননি। সমস্ত পাঠ্যাবস্থার ছবির িছনে এই মাষ্টারটিই উজ্জ্বল পৃষ্ঠপট হয়ে আছেন চিরকাল। বড় ালবাসতেন ছেলেদের, আজও বোধহয় বাসেন।

এ মাসের মাইনের অবশিষ্ট দশটি টাকা পকেটে করে নিয়ে বেরিয়েছিলেন ভবতোষবাবু, স্ত্রীর একজোড়া শাড়ীর খোঁজে। আর না হলে লে না! তবু সেই নোটটাই পকেটের মধ্যে হাত পুরে বারকতক াড়াচাড়া করে একসময়, মরীয়া হয়ে বার করে ফেলেন। তারপর কবার হেঁট হয়ে প্রণাম করে নোটখানা শক্তিবাবুর পায়ের ওপর রেখে লেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, যৎসামান্য প্রণামী। এ দেবার দাবী াছে আমাদের। আর, আর কাল থেকে আমি পোর্টার দিয়ে এক পো রে দুধ পাঠিয়ে দেব, আপনি খাবেন। দুধ ত আমাদের কিনতে হয় , ওতে সঙ্কোচের কারণ নেই।'

শক্তিবাবু প্রথমটা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কী একটা বাধা দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শেষ অবধি পেরে উঠলেন না। বিহ্বল এবং অপ্রতিভভাবে টাকাটা হাতে করে বসে রইলেন। অবশ্য তাঁকে বেশীক্ষণ অবসরও দিলেন না ভবতোষবাবু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লেন।

অপরাহ্ণের রাঙা রোদ নারকেল গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকেছে। ছেলেরা দু একজন এসে জড়ো হচ্ছে, বোধ হয় বল-টল খেলবে। তাঁরাও এই সময় খেলতে আসতেন এখানে। ফুটবল খেলার রেওয়াজ ছিল খুব, এখনকার মত হকি ক্রিকেট তখন তাঁরা জানতেন না।

ভবতোষবাবু প্রসন্ন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চেয়ে নিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরলেন।

এই দমকা বাজে খরচটার জন্ত কাল হয়ত অনুতাপের শেষ থাকবে না মনে মনে, তবু এখন যেন একটা আত্মতৃপ্তিই অনুভব করেন। সমস্ত অন্তরটা কেমন এক ধরণের আবেগ-ছলো-ছলো, বেদনাস্নিগ্ধ প্রসন্নতায় ভরে থাকে। জীবনের যে জীর্ণপত্রটা উড়ে গেছে অনেকদিন আগে তাই যেন একটা দমকা হাওয়ায় একবার উড়ে এসেছিল, স্মৃতিতে বহু-পূর্বে হারিয়ে-যাওয়া নবীনতার ছোঁয়াচ লাগিয়ে আবার উড়ে চলে গেছে। সে ছোঁয়াচে বেদনা লেগেছে সত্য কথা, কিন্তু আনন্দও পেয়েছেন বৈকি!

পাঁচটা সাতান্নর গাড়ীর সিগন্যাল দিয়েছে। এইতেই ভিম নামবে। ভবতোষবাবু একটু জোরে পা চালান।

ঈশ্বরের লজ্জা

অনন্ত। সীমাহীন মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্র ও গ্রহ, পরস্পরের সহিত কোটি কোটি যোজন ব্যবধান রচনা করিয়া বিরাজ করিতেছে। কোনটা সূর্যের দশ গুণ বড়, কোনটা বা লক্ষ গুণ। কোন নক্ষত্রের গ্রহ আছে—কেহ বা সঙ্গিহীন। কোথাও প্রাণীজগৎ আছে—কোথাও জীবলক্ষণ-মাত্র নাই।

এই মহাশূন্যের মধ্যেই অসংখ্য ভাগ আছে। তার মধ্যে কতগুলি স্বর্গ কতগুলি দেবলোক কতগুলি ব্রহ্মলোক আছে তাহার কোন হিসাবই মেলে নাই নারদের। অথচ তিনি সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত শুধু ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন। ইচ্ছামাত্র গতি তাঁর, শূন্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া নারদ দিবারাত্র ঘুরিতেছেন; বাতাসের চেয়েও দ্রুত চলেন তিনি, রেডিও পরিচালিত রকেট বোমাও আজ পর্যন্ত তাঁহার মত দ্রুত যাইতে পারে নাই। আর চলিতেছেন বা কত দিন! কত মনু গেল, কত কল্প গেল তাঁহার চলার আর বিরাম নাই। তবু ত এই সৃষ্টিটার কোন হদিস্ পর্যন্ত মিলিল না। মনে মনে ধারণাও করা গেল না অনন্তটা কত বড়। তাই বিরক্ত হইয়া ইদানীং নারদও মাপজোপের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে যে জীবলোকগুলি তাঁহার ভাল লাগে, সেই গুলির মধ্যেই তিনি পালাক্রমে ঘুরিয়া বেড়ান।

পৃথিবীর উপর মহর্ষি নারদের প্রীতিটা একটু বেশী। মানুষ নামধেয় জীবগুলি তাঁহাকে বেশ মানে গণে। তাহারা তাঁহাকে বিষাদের দেবতা করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার সম্মানার্থে ঝগড়া বিবাদ

লড়াই তাহারা প্রায়ই করে। কিন্তু সম্প্রতি পৃথিবীতে আসিতে গিয়া আর একটু হইলে অমরত্ব প্রায় ঘুচাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহারই ষোড়শোপচার পূজার আয়োজনে আনবিক বোমা না কি একটা বস্তু পৃথিবীর মানুষগুলি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছে তা তিনি জানিতেন না। হঠাৎ সেই বোমাটি ফাটার ফলে কিছুক্ষণের জন্য মহাশূন্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে নানা উৎপাত শুরু হয়—নারদের গতিতেও গণ্ডগোল ঘটে। তিনি পড়ন্ত এরোপ্লেনের মত তাল পাকাইতে পাকাইতে কোথায় একটা নিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন, অতিকষ্টে দৈব অনুগ্রহে এ যাত্রা সামলাইয়া লইয়াছেন।

তবে বাঁচিয়া গেলেও নারদ বিরক্ত হইয়াছেন, পৃথিবীতে আসিবার সাধ তাঁহার মিটিয়াছে। এই ক্ষুদ্রকায় জীবগুলি কখন কি যে কাণ্ড করিয়া ফেলিবে তার ঠিক কি! তা ছাড়া ইহাদের একটা ব্যাপারে বড় কৌতুক বোধও করিতেছেন তিনি—কথাটা শ্রীভগবানকে না বলা পর্যন্ত শান্তি নাই। সেইজন্যই আজ তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র পার হইয়া, অগনিত জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা ডিঙ্গাইয়া তিনি দ্রুততমগতিতে চলিয়াছেন। কোথায় কোন্ লোক হইতে অপূর্ব সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে, কোথায় কোন্ নক্ষত্র বর্ণনাতীত অপরূপ দ্যুতিতে উদ্ভাসিত সে সবের দিকে আজ ভ্রূক্ষেপও নাই নারদের—লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে সাইকেলারূঢ় সঙ্গীতজ্ঞের গানের কলি যেমন মুহূর্তের জন্য আমাদের কানের কাছে বাজিয়া আবার দূরে মিলাইয়া যায়—তেমনই এসব প্রভাবও আজ নারদের উপর অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। আজ আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। পার্থিব সময়ের হিসাবে মাপা যায় না যেখানকার সময় ও দিনরাত্রি—এমনিই একটা অংশে নিরাকার ঈশ্বর লীলাচ্ছলে আকার ধরিয়া উপযুক্ত ভক্তদের

দর্শন দেন। ক্ষীরোদশয়নে অনন্তশয্যায় শয়ান্ মেঘ-নীলবর্ণ পরম-পুরুষরূপেই নারদ তাঁহাকে দেখিতে ভালবাসেন, নারদের ইচ্ছায় সেইরূপেই তিনি প্রকাশিত হন্। আজও নারদ এক মনে তাঁহার সেই রূপটি ধ্যান করিতে করিতেই ছুটিয়াছেন—হাতের বীণাযন্ত্রে মধ্যে মধ্যে ঘা দিয়া ওঙ্কার ধ্বনি সৃষ্টি করিতেছেন—মুখে করিতেছেন স্তব।

অবশেষে এক সময়ে ঈশ্বরের দর্শন মিলিল। নারদের স্তব গান শেষ হইলে শ্রীভগবান প্রসন্ন হাস্যে তাঁহাকে অভয় দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'সংবাদ কি বৎস?'

'সংবাদ একটু আছে বৈকি প্রভু! আচ্ছা, পৃথিবীর কথা মনে আছে আপনার?'

'পৃথিবী? সেটা আবার কি?' বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করেন ভগবান।

নারদ আরও বিস্মিত হন—'পৃথিবীর কথা ভুলে গেছেন প্রভু। সেই যে সূর্য বলে একটা নক্ষত্রের চার পাশে ছোট গ্রহটা ঘুরপাক খায়। সেই যেখানে কয়েকবার আপনার প্রত্যক্ষ বিভূতি প্রকাশ পেয়েছিল অবতার রূপে? সেখানকার প্রধান জীব হ'ল মানুষ। তাদের কথা ভুলে গেছেন এরই মধ্যে—তাদের ওপর ত আপনার দয়া একটু বেশীই ছিল প্রভু!'

নারদের কণ্ঠস্বর একটু ক্ষুব্ধ শোনায়। ভগবান আরও মধুর ভাবে হাসেন। বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে—তা সেখানকার কি খবর?'

কিন্তু নারদের আর সেদিকে মন নাই। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা ঠাকুর, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। ঠিক ঠিক জবাব

দিতে হবে কিন্তু! যদিও আজ পর্যন্ত আপনার এবং আপনার সৃষ্টির কিছু হদিশ পেলুম না, তবু মোটামুটি একটা ধারণা ছিল যে আপনি এই সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনারই অংশ। তা যদি হয় তা হলে আপনি এদের কথা ভুলে যান কি করে? ঐ যে মানুষ নামধেয় ক্ষুদ্র জীব—ওরাও ত আপনারই অংশ!'

ঈশ্বর বলিলেন, 'নারদ, একটা উপমা দিই, তা হ'লেই বুঝবে। ঐ যে মানুষের কথা বলছ, ওদের ত ঐটুকু দেহ। ওরই মধ্যে যে রক্তস্রোত বইছে তাতে কত কোটি বীজাণু ঘুরে বেড়ায়, তার খবর রাখো? তুমি না রাখলেও মানুষ নিজে রাখে, এক রকম যন্ত্রও বানিয়েছে অনুবীক্ষণ ব'লে, তাতে করে দেখতেও পায়। ওরা জানে যে ঐ জীবাণুগুলো প্রতিমুহূর্ত ওদের দেহের মধ্যে বিচরণ করছে; কিন্তু তাই ব'লে কি ওরা সেটা অনুভব করতে পারে, না প্রত্যেকটি বীজাণুকে চিনে রেখেছে? ওদের দেহের মধ্যে যে আরও অতগুলো জীবিত প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে সে সম্বন্ধে ওরা সচেতনও থাকে না অধিকাংশ সময়ে! তেমনি আমারও এই বিশ্বদেহে পৃথিবী আর তার মানুষ কতটুকু অংশ বলো। ঐ বীজাণুগুলোর চেয়েও ছোট নয় কি? আমার পক্ষে কি ওদের হিসাব রাখা সব সময়ে সম্ভব?'

তা বটে! নারদ লজ্জিত হইলেন। কথাটা তাঁহারই ভাবা উচিত ছিল।

শ্রীভগবান্ প্রশ্ন করিলেন, 'সে কথা যাক্ গে—এখন তুমি কী বলতে এসেছিলে তাই বলো। ব্যাপার কি!'

'আর ব্যাপার কি! ঐ ত ক্ষুদ্র পৃথিবী, আর তার ঐটুকু

টুকু প্রাণী, তারই দাপট্ কি কম? আপনার ভক্ত নারদের দফা শেষ করে দিয়েছিল আর কি!'

ভগবানও কৌতূহলী হইয়া উঠেন, 'কি রকম, কি রকম? কী করেছে ওরা?'

নারদ তখন আনবিক বোমা বিস্ফোরণের ইতিহাসটা খুলিয়া বলেন। আকাশের বিদ্যুৎ তরঙ্গে গোলযোগ বাধার ফলে কী পর্যন্ত জব্দ হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা শেষ করিয়া কহিলেন, 'কিন্তু এটা বলতেও আমি আসিনি প্রভু। আমি এসেছিলাম একটা মজার কথা বলতে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ বলে একটা দেশ আছে, খুব প্রাচীন দেশ—মানে পৃথিবীতে যতদিন মানুষ জন্মেছে ততদিন থেকেই ওখানে তাদের একদল থাকে। ওখানেই আপনার বিভূতি অবতীর্ণ হয়েছে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী বার।—'

ঈশ্বর বাধা দিয়া কহিলেন, 'হ্যা হ্যাঁ—মনে আছে আমার। বলো—'

নারদ কহিলেন, 'দেশটির মাটি এমন যে ওখানে লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাবটা একটু বেশী। ঈশ্বরকে ওরা সবাই মানে, পূজা-আচ্চাও করে। কিন্তু সেইটে কি ভাবে হবে এই নিয়ে ঐ দেশের লোকের মধ্যেই দুটো দল হয়ে গেছে আর তারা তাই নিয়ে অহোরাত্র ঝগড়া বিবাদ করছে।'

'তাই নাকি?', শ্রীভগবান একটু কৌতুক বোধ করেন, 'আরে তার সঙ্গে ওদের ব্যবহারিক বা পার্থিব জীবনের সম্পর্ক কি?'

'তাই কে বলে! বিবাদ বিসম্বাদ চলছে অনেক দিন ধরেই, সম্প্রতি একেবারে রক্তগঙ্গা বওয়া শুরু হয়েছে। খুন-জখম, অগ্নিকাণ্ড,

নারীহরণ, তাদের অপমান—এমন কোন পাপ নেই, ধর্মের নামে তারা যা করছে না।'

'এ কাজগুলো অবশ্য মানুষ আজ নতুন করছে না, ধর্মের নামে খুন-জখমও তারা শুরু করেছে অনেক দিন থেকেই—কিন্তু নারী-হরণ-টরণগুলো ঠিক বোধ হয় এতদিন ছিল না। বিশেষ করে ধর্মের নামে—এটা একটু নতুন বটে।'

'সে ভীষণ ব্যাপার ঠাকুর। দেশটা বুঝি যায়। আপনি একটু মন দিন এবারে!'

'তাইত নারদ, ভাবিয়ে তুললে যে! আমাদের বিশ্বাস ছিল যে ধর্ম এবং ঈশ্বরবাদ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হতে বসেছে ক্রমে—এখনও এই নিয়ে এত কাণ্ড! বলো কি!'

'বলি কি সাধে প্রভু। সব দেশেই ওটা কমেছে ঠিক, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় হয়েছে কাল। সব জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়েছে বোধ হয় ভারতবর্ষেই।...প্রভু, আপনি একবার যান—আপনি ভক্তবৎসল সবাই জানে, অথচ আপনাকে ডেকে ডেকেই তারা অমন বেঘোরে মরছে, আপনি একটা উপায় করুন!'

ঈশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও যাও—দেখি কি করতে পারি।'

নারদ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মার এক নিমেষে চার যুগ কাটিয়া যায়—ঈশ্বরের এক নিমেষে অমন বহু ব্রহ্মার জীবনান্ত হয়। কিন্তু ভক্তবৎসল ঈশ্বর নারদের সুবিধার জন্য পার্থিব সময়ের হিসাবেই দেখা দেন। সেই অবস্থাতেই

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন ব্যাপারটা।

হ্যাঁ—দায়িত্ব তাঁহার একটা আছে বৈ কি! বেচারী মানুষগুলি তাঁহার জন্যই কষ্ট পাইতেছে। তাঁহার বিভূতি পৃথিবীর নানা দেশে স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিয়া নানারূপে প্রকাশ পায়, নানা ভাবে মানুষকে জীবনধর্ম শিক্ষা দেয়। মানুষের পক্ষে কি সম্ভব তাহার মূলটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঈশ্বরের আসল অস্তিত্ব অনুভব করা?

মানুষের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। মানুষের স্বভাব-ধর্ম কৌতূহলও তাঁহাকে পাইয়া বসিল। মন্দ কি, ব্যাপারটা দেখিয়া আসাই যাক না।

সব চেয়ে কৌতূহল হইল তাঁহার সেই মন্দিরগুলি দেখিবার—ভক্ত ভারতবাসী যেখানে তাঁহাকে পূজা করে, ভক্তি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হয়।

যে কথা সেই কাজ।

ঈশ্বর মানুষেরই দেহ ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে একটি বড় সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানুষের দেহ বটে—তবু ইচ্ছামাত্রই তিনি এখানে আসিতে পারিলেন। দেহ ধারণ করিতে হইল এই জন্য যে নহিলে এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার তেজোময় দেহকে সংহত করিয়া আনা অসম্ভব।

ভগবান যেখানে উপস্থিত হইলেন সেটা একটা বড় মন্দির। ঠিক কোন্ সম্প্রদায়ের তাহা বুঝিতে না পারিলেও ভীষণ ভীড় দেখিয়া বুঝিলেন সেটা একটা বড় মন্দির, লোকের কথাবার্তার ভাবে বোঝা গেল যে ভিতরে মূর্তি আছে। মন্দিরের প্রবেশপথে সারি

সারি দোকান—কোনটা বা পূজার ফুল বিক্রী করিতেছে, কোনটা বা সিঁদুর—বেশীর ভাগই মিষ্টান্নের। রাস্তায় পাণ্ডার দল যাত্রীদের যেন ছিঁড়িয়া খাইতেছে আর তেমনি কি ভিখারীরও উপদ্রব! কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভগবান গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিলেন।

কৌতূহলী হইয়া তিনি একটা দোকানের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। দূর হইতে যেগুলিকে সন্দেশ বলিয়া ভুল হইয়াছিল সেগুলি কাছে আসিতে দেখা গেল, শর্করার ডেলা। ভগবান একটু হাসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ ভাই—এ কি খাবার সব? এদেশে ত শুনেছি ভাল খাবার তৈরি হয়। তবে এমন দশা কেন সন্দেশের?'

দোকানদার বিস্মিত হইয়া তাকাইল, 'ও, আপনি নতুন বুঝি? বাইরের দোকান ভাল খাবার করে তার মানে ওসব যে বাবুরা খায়। এ পুজোর জিনিষ এমনিই হয়। এখানে যা দেব যাত্রীরা তাই নেবে। আর ঠাকুর ত কথা বলেনা! হিঃ-হিঃ—'

সিঁদুর যাহারা বিক্রয় করিতেছে তাহারা নাকি গাওয়া ঘিতে সিঁদুর গুলিয়া দিতেছে। ভগবান একটা খুরি তুলিয়া লইয়াই বুঝিলেন যে গোমাতা এ ঘিয়ের কাছ দিয়াও যান নাই! তুলার বীজ প্রভৃতি হইতে যে তৈলাক্ত পদার্থ নিস্থত হয়—এ সেই জিনিষই।

শেষ পর্যন্ত ফুলের মালার দোকান।' একগাছি সরু মালা চার আনা। একজন যাত্রী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'বাজারে যে এর সিকি দর—হ্যাঁ হে? কী বলছ?'

'এটা ত বাজার নয়—' ফুলওয়ালা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, 'মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন এখানে দরদস্তর কী?'

মালাও কেনা হইল না, ভগবান শুধু হাতেই ভিতরে ঢুকিলেন।

কজন পাণ্ডা তাঁহার পিছনে লাগিয়াই আছে, কোনমতেই তাহায় হাত ড়াইতে পারেন নাই।

ভিতরে ঘেঁষাঘেঁষি ভীড় দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, যাক— ার কিছু না থাক্ অন্তত ভক্তিটা আছে। কিন্তু শীঘ্রই তাহার ম ভুল ভাঙিল। ভিতরে যাহারা আছে—পূজারীর দল —তাহাদের ভক্তির লেশ মাত্র নাই—তাহারা বোধ হয় ধরিয়াই ইয়াছে যে ভিতরের প্রতিমা এক টুকরা পাথরই শুধু, এটা অর্থ াপার্জনের স্থান ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ভাবেই দেবী মূর্তিকে ম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রীদের কাছ হইতে নানা কৌশলে অর্থ অপহরণ রিতে ব্যস্ত। আর যাহারা আসিয়াছে এত কষ্ট করিয়া, এত প্রতারিত ইয়া পূজা দিতে, তাহাদেরই বা সে ভক্তি সে প্রীতি কৈ? প্রায় সবাই াসিয়াছে কিছু না কিছু প্রার্থনা করিতে। লোভের চেহারা তাহাদের কলেরই চোখে মুখে প্রকট। ভগবান বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে ারিয়া পড়িলেন। যে পাণ্ডাটি সঙ্গে আসিয়াছিল সে ব্যাকুল হইয়া ীড়ের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল—যাত্রীকে আর দেখিতে পাইল না।

ভগবানকে দেখিবার উপায়ও ছিল না, কারণ তিনি এবার অশরীরী র্তি ধারণ করিয়া ছিলেন; পাণ্ডাদের এত টানা-হ্যাঁচড়া তাঁহার সহ্য হইবে না। যাক—সেখান হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আর একটা মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িলেন। এটা আগের মন্দির হইতে কিছু পৃথক ধরণের। ভিতরে দেব দেবীর মূর্তি নাই। শুধু দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া যাত্রীরা পাশাপাশি বসিয়া উপাসনা করে। যাক্—এটা অন্তত ভক্তির স্থান বটে, ভগবান মনে মনে ভাবিলেন। বাহিরের সে ব্যবসা বা পাণ্ডাদের কচকচি নাই— একটিই মাত্র ফুল ও ধূপের দোকান।

কিন্তু ভিতরে পা দিতেই তিনি অবাক হইয়া গেলেন। মন্দিরের মধ্যে লোক আছে বিস্তর, তবে মোট তিনটী লোক আছে উপাসনার স্থানে, বাকী সবাই অন্যত্র ব্যস্ত। এক পাশে স্তূপাকার আছে কতকগুলি লাঠি ও লৌহ শিরস্ত্রাণ—যেন যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত। লোকগুলি একস্থানে জড়ো হইয়া দ্রুত অথচ নিম্নকণ্ঠে কি আলোচনা করিতেছে—আর একটু কাছে আসিতে বুঝিলেন রাজনৈতিক আলোচনা। কতকগুলি পুরোহিত শ্রেণীর লোককে তালিম দেওয়া হইতেছে ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে কেমন করিয়া সাধারণ অশিক্ষিত লোককে ক্ষেপাইয়া তুলিতে হইবে। এ সমস্তরই লক্ষ্য অপর সম্প্রদায়ের লোককে জব্দ করা। তাহারা নাকি বহুদিন হইতে ভাল চাকরী, ভাল জমি, ভাল ভাল ব্যবসাগুলি দখল করিয়া বসিয়া আছে—যেমন করিয়াই হউক তাহাদের উচ্ছেদ করিতে হইবে। পুরোহিতদেরও খুব উৎসাহ, যেসব লুঠপাট এবং নারীহরণের চিত্র কল্পনায় অঙ্কিত হইতেছিল তাহাতে তাহাদের দৃষ্টি লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে! লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য যেসব উপায় আলোচিত হইতেছে তাহার দুই একটি কথা শুনিয়াই ভগবান্ শিহরিয়া উঠিলেন। সেখান হইতে তাড়াতাড়ি গিয়া দাঁড়াইলেন উপাসনারত ভক্তদের কাছে—এখানে তবু কিছুটা নিষ্ঠা আছে ত!

কিন্তু সেখানে গিয়াও হতাশ হইলেন। প্রত্যেকেরই তাড়া আছে, মন্ত্রগুলি পড়িয়া লইতেছে দ্রুত কোনমতে কাজ সারিবার জন্য। একজনের কান পড়িয়া আছে পিছনের ষড়যন্ত্রের দিকে, সে সেখানে যাইতে পারিতেছে না বলিয়া বিরক্ত। আর একজন ভাবিতেছে তাহার কন্যার বিবাহের কথা, তাহার ঠোঁটই নড়িতেছে শুধু, মন্ত্রের দিকে মন নাই আদৌ। টাকা চাই যেমন করিয়াই হউক—ঈশ্বর কি দিবেন? ঈশ্বরকে ডাকিয়া কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। আসলে তাহাকেই

াগাড় করিতে হইবে।...তৃতীয় ভক্তটি নিতান্তই অল্পবয়সী। তাহার টিও নড়িতেছে না। সে শুধু অপর দুইজনকে ভাবভঙ্গীতে নকল রিয়া যাইতেছে। আসল কথা, তাহার একটা সরকারী চাকুরী চাই—নি চাকুরী দিবার মালিক অর্থাৎ যাঁহাকে সে মুরুব্বি ধরিয়াছে, তিনি াজ এখানে আসেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকেও এখানে আসিতে হয়।

মুহূর্ত-কয়েক দাঁড়াইয়া ভগবান সেখান হইতেও বাহির হইয়া ড়িলেন। আরও খানিকটা হাঁটিবার পর একটা গলির মোড়ে হৈ-চৈ নিয়া তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলেন। কাছে গিয়া দেখিলেন আর কিছু য়—কী একটা বারোয়ারী পূজা হইতেছে। স্থানাভাবে রাস্তারই ানিকটা ঘিরিয়া লইয়া পূজা মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। গলির সমস্ত নাংরা জল যেথান দিয়া যায় এবং পথিকেরা যেখানে প্রাকৃতিক কার্য ারে সেই নর্দমার উপরেই আলপনা দেওয়া চৌকী পাতিয়া প্রতিমা সান হইয়াছে। রাস্তার উপরেই পুরোহিত বসিয়াছেন পূজা করিতে, নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণও সেইখানেই সাজাইতে হইয়াছে। প্রতিমা কী একটা দেবী মূর্তির—পূজাটাও আকস্মিক। কোন একটা রোগ উপলক্ষ্যেই ভয়ে ভয়ে পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। বোধহয় সেইজন্যই চাঁদা উঠে নাই—উপকরণ ও আয়োজন সামান্য। কোনমতে অল্পদামের কিছু ফল আসিয়াছে, মিষ্টান্নের বদলে বাতাসা। তা হোক্—ভগবান মনে মনে ভাবিলেন, আন্তরিক ইচ্ছাটাই বড় কথা, টাকা ওঠে নাই, বেচারীরা কী করিবে?

কিন্তু একটু পরেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। কর্তারা যেখানে বসিয়া আলোচনা করিতেছেন সেখানে গিয়া দাঁড়াইতে শুনিলেন যে, মণ্ডপ-সজ্জাতেই কয়েক শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। যাত্রাগানের বায়না

দেওয়া হইয়াছে সেটা আজ, কাল পাড়ার ছেলেরা থিয়েটার করিবে, তাহাতেও মোটামুটি খরচা আছে। এ ছাড়া কোন্ এক পল্লীর ব্যায়ামাগারকে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহারা কসরৎ দেখাইয়া যাইবে—ধর্মকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে শরীর-চর্চার প্রয়োজন। পাড়ার ছেলেদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই ও ব্যবস্থাটা করা হইয়াছে। তা ছাড়া—গত দাঙ্গাতে যে বকাটে ছেলেগুলির জন্য পাড়া বাঁচিয়াছে, যাহারা বেশী শত্রু হত্যা করিয়াছে তাহাদের ভাল করিয়া খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেটা কাল হওয়া চাই, কারণ মদ এবং মাংসের আয়োজন আছে তাহাদের জন্য।

এই সব আলোচনা হইতেছে, একটি ছেলে আসিয়া বলিল, 'ঠাকুর মশাই বলছিলেন যে, তিনখানা কাপড় দরকার তার জায়গায় একখানাও আসেনি, গামছা এসেছে মোটে একটি—কী করে হবে?'

একজন মাতব্বর ধমক্ দিয়া বলিলেন, 'ঐতেই চালিয়ে নিতে বলো। অত আর পেরে উঠছি না। এদিকে কত খরচ এখন মাথার উপর তার খেয়াল আছে? ওঁদের আর কি, খালি আদায়ের ফিকির—'

হতাশ হইয়া ভগবান সে গলি হইতেও বাহির হইয়া পড়িলেন। আরও খানিকটা চলিবার পর দেখিলেন একটা বড় রাস্তার ধারে ভীষণ ভীড়। গাড়ী-ঘোড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কৌতূহলী হইয়া একটু উর্দ্ধে উঠিতেই দেখিলেন যে একটি সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। শোভাযাত্রাটি ধর্মের সহিত জড়িত। বহুদিন পূর্বে তাঁহারই এক বিভূতি কোন্ সুদূর মরুভূমে আবির্ভূত হইয়াছিল নররূপে—তারপর সেই মহামানবেরই সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে যেন যুদ্ধে মারা যায়, তাহারই শোকের স্মৃতিতে এই শোভাযাত্রা। যে ধর্মমত ইহারা মানিয়া চলে,

হার মহিমা প্রচারে ইহাদের আগ্রহের অন্ত নাই—সে ধর্ম—পৌত্তলিক
ন—নিরাকার পরম ব্রহ্মকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়া মনে করে, সেইজন্য
পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর ইহাদের প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ, অথচ
বেকার একটি স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ঘটনাটার অভিনয় হইতে
াকে প্রতিবৎসর, মায় একটা নকল শবাধার পর্যন্ত ইহারা সঙ্গে রাখে।
কান প্রতীক্ উপলক্ষ্য করিয়া ধর্মের অনুষ্ঠানে এত আপত্তি অথচ কয়েক
তাব্দী পূর্বের সমস্ত প্রতীকগুলিকে ধরিয়া আছে আজও—

শোভাযাত্রাটা শোকের, কিন্তু ভগবান দেখিলেন যাহারা আসিতেছে
তাহাদের মধ্যে শোকের চিহ্ন মাত্র নাই। আছে যেটা সেটা একটা
বিদ্বেষের। এই উপলক্ষ্যে একশ্রেণীর লোক জনসাধারণকে উত্তেজিত
করিতেছে অপর সম্প্রদায়ের লোকের বিরুদ্ধে। চোখে চোখে জিঘাংসা,
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে হিংসা। ইহারই মধ্যে কে কাহাকে ইট ছুড়িবে, কে
কাহার পিঠে ছুরি বসাইয়া পুণ্য অর্জন করিবে এবং ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র
হইয়া উঠিবে সেই সুযোগ খুঁজিতেছে। তাহারও পিছনে লোভের
চেহারাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই লোকগুলি চলিয়া গেলে তাহারা
কত প্রকার পার্থিব সুবিধা পাইবে তাহারই কল্পনা এই সদ্যজাগ্রত ধর্মবুদ্ধি
ও ঈশ্বরপ্রীতিকে ইন্ধন জোগাইতেছে।

ব্যথিত ঈশ্বর একবার সারা দেশটার উপর তাঁহার দিব্যদৃষ্টি বুলাইয়া
লইলেন। সর্বত্রই এই এক ছবি। মানুষ মানুষকে হত্যা করিবার
চক্রান্ত করিতেছে তাঁহারই, নাম লইয়া। এক সম্প্রদায়ের নেতারা
অপর সম্প্রদায়কে শাসাইতেছে ঈশ্বরের দয়ার ভরসায়। কেহ মন্দিরের
মধ্যে দেব বিগ্রহের সামনে শপথ করিতেছে অপর ধর্মমতাবলম্বীদের বধ
করিবার—কোথাও বা পুরোহিতের দল ধর্মগ্রন্থের উপর হাত রাখিয়া
শপথ করাইয়া লইতেছে সেই একই কাজের জন্য। হত্যা, নারীহরণ,

লুণ্ঠন, গৃহদাহ—ঘুষ দেওয়া, প্রতারণা করা, যত-কিছু নীচু কাজ সবই চলিতেছে কিন্তু প্রত্যেকটার মধ্যেই তাঁহার নাম আছে। বিচারক ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায় করিতেছেন—বিবেককে সান্ত্বনা দিতেছেন এই বলিয়া যে, তিনি তাঁহার ধর্মের জন্যই এই সব করিতেছেন। শাসকরা তাঁহাদের কর্তব্য ভুলিয়া সিংহাসনে বসিয়াই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন যে তাঁহারা যে সম্প্রদায় ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ের লোকেই যাহাতে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় এবং অপর ধর্মমতাবলম্বীরা যৎপরোনাস্তি জব্দ হয়। ধর্ম ও ঈশ্বর কোথাও নাই অথচ তাহারই জন্য যত কিছু অশান্তি—। মন্দির ও উপাসনাগারের চার পাশেই যেন বেশী অনাচার, বেশী পাপ। দেবোত্তর সম্পত্তিলইয়াই যেন বেশীষড়যন্ত্র, বেশী মামলা মোকদ্দমা। ঈশ্বর ও তাঁহার অংশ স্বরূপ দেবদেবীরা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ের পণ্য লইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতেছে, একই ধর্মমতের মানুষকে ঈশ্বর-উপাসনায় বাধা দিতেছে তাও তাঁহারই নাম লইয়া—

ভগবান অন্যমনস্ক ভাবে পথ হাঁটিতে হাঁটিতে কোন্ এক পাড়ায় আসিয়া পড়িয়াছেন এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই। সহসা দেখিলেন তাঁহার চারিদিকেই ধ্বংসস্তূপ—ঘরবাড়ী ভাঙ্গা, কোনটা বা পুড়িয়া গিয়াছে। গলিত অর্ধদগ্ধ অঙ্গারাবশিষ্ট শবদেহ ইতস্তত ছড়ানো। জীবিত প্রাণীদের মধ্যে শুধু শৃগাল কুকুর আছে সমস্ত পল্লীটাতে।

কিন্তু না—ঐ যে কাহারা আসিতেছে। একদল লোক আর এক দল লোককে দেখাইতেছে এই সব। উহাদের কি দুঃখ হইয়াছে? না—আনন্দের হাসি যে! ভগবান কাছে আসিলেন। শুনিলেন একটি লোক বলিতেছে, 'সব আমরাই করেছি হুজুর। জ্যান্ত কাউকে রাখিনি, শুধু ছুঁড়িগুলোকে রেখেছি হুজুরদের জন্য। আর যারা আমাদের

ভগবানকে মানতে রাজী হয়েছে ওদেরও ছেড়ে দিয়েছি। মেহন্নৎ বহুৎ হয়েছে—বখশীষটা সেই মত চাই।'

হুজুরের দল প্রসন্ন হাস্যে অভয় দিলেন।

ভগবান তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিতে তাঁহার পায়ের নীচে কি যেন ঠেকিল। চাহিয়া দেখিলেন একটি অল্প বয়সী মেয়ে রাস্তার ধুলার সহিত মিশিয়া আছে। রোগে কিংবা অন্য কারণে মুমূর্ষু হইয়াছে বোঝা গেল না—তবে সে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহা সেদিকে চাহিলেই বোঝা যায়।

হয়ত অজ্ঞান হইয়াছিল—ঈশ্বরের পায়ের স্পর্শে চমক ভাঙ্গিয়া যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর বাহির হইতে চাহে না, অস্তিম আকুতি প্রাণপণ চেষ্টায় বাহির হইয়া আসে, 'ভগবান—তুমি কি নেই প্রভু? আর যে পারি না।'

ঈশ্বরের অশরীরী দেহ নিঃশব্দে আবার মহাশূন্যে মিশাইয়া গেল। মেয়েটিকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন—সে আর কেহ নয় চল্লিশকোটি সন্তানের জননী ভারতমাতা!

ভগবান বোধহয় লজ্জাতেই তাহার কাছে পরিচয় দিলেন না।

মাষ্টার মশাই

আমাদের মাষ্টার মশাই পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ইস্কুল থেকে রিটায়ার ক'রেছেন আজ বারো বছরেরও বেশী কিন্তু ইস্কুলের মায়া এখনও কাটাতে পারেন নি।

গ্রাম ছিল এককালে, আজ আর নেই। শহরের আয়তন বাড়তে বাড়তে সে গ্রাম কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ সেখানে দুটো ছেলেদের এবং দুটো মেয়েদের হাইস্কুল, এছাড়া একটা কলেজও সম্প্রতি গড়ে উঠেছে ছেলেমেয়ে সকলকার জন্যই। তবু এখনও সেই অবলুপ্তপ্রায় গ্রামের চিহ্ন-স্বরূপ ভাঙ্গা টিনের চালার নীচে হেলে-পড়া নিজস্ব বাড়ীতে সত্তর বছর আগেকার মাইনর ইস্কুলটি টিকে আছে। হয়ত নিজস্ব বাড়ী ব'লেই আছে, আর সরকারী বৃত্তিটা আজও বন্ধ হয়নি ব'লে—নইলে ছেলেদের মাইনে থেকে ইস্কুল চলবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মাইনে অবশ্য আর আগেকার মত নেই, ঢের বেড়েছে, তবু সাতষট্টি ত মোট ছাত্র। কত আয় হ'তে পারে বলুন!

এ হেন মাইনর ইস্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন পূর্ণবাবু—মোট সাতচল্লিশ বছর। এফ্‌ এ পাস ক'রে বছরখানেক যেন অন্য কোথায় কি করেন তার পরেই এসে ঢোকেন এইখানে, একেবারে হেড মাষ্টার হ'য়ে। তখন মাইনে ছিল বাইশ, রিটায়ার ক'রেছিলেন যখন, তখন হয়েছিল পঁয়ত্রিশ। এর বেশী বাড়ানো ও ইস্কুলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু ত ষাট বছর বয়স হবার পরও স্কুল কমিটি নানা তাল-বাহানায় ওঁকে আরও তিন বছর রেখে দিয়েছিলেন—ইন্‌স্পেক্টরদের ধমক সহ্য ক'রেও। তারপর ওঁর এই দীর্ঘ দিনের সেবা স্মরণ ক'রে কোনমতে মাসিক সাতটাকা একটা পেন্‌সনের ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছেন। ইস্কুলের আইনে নেই, এই অজুহাতে গবর্ণমেন্ট সেটাও আটকাতে চেয়েছিল কিন্তু সেক্রেটারী অজিতবাবুও বড় সরকারী চাকুরে—তিনি তদ্বিরতদারক ক'রে ব্যবস্থাটা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশী কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। ঐ ত আয়—নতুন হেড মাষ্টার রাখতে হ'ল আটাশ টাকায়—নইলে ভাল লোক পাওয়া যায়

এ ছাড়া কুড়ি, আঠারো, ষোল, বারো—আরও চার জন মাষ্টার আছেন। এতে চলে কি ক'রে?

প্রশ্নটা অনেক বার উঠেছে—এ স্কুল রাখবার দরকারই বা কি। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে এখন, পুরাতন ঐ শিক্ষাব্যবস্থা বাদ দিলে দোষ কি?

কিন্তু পুরানো পৃথিবীর এই মুছে-যাওয়া গ্রামখানির পুরনো যে ক'ঘর বাসিন্দা আজও আছে, তারা পারে না ওর মায়া কাটাতে। তখনকার দিনে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখতো ঐ শিক্ষায়তনটি, বহু কষ্টে বহু দুঃখে ওর প্রতিষ্ঠা। এতগুলি পরিবারের ছিল ঐ একমাত্র ভরসা, ছেলেরা মানুষ হ'য়ে লেখাপড়া শিখে চাকরী ক'রবে—এই আশায় একটু একটু ক'রে একদিন ওটি গড়ে তুলেছিলেন এদের পূর্বপুরুষরা। প্রাথমিক শিক্ষা এইখানে শেষ ক'রে কেউ যেত শহরে আরও প'ড়তে কেউ বা সেই বিদ্যা সম্বল ক'রেই কোন সওদাগরী অফিসে গিয়ে ঢুকত। অঙ্ক আর ইংরাজী গ্রামার এই দুটোতে জোর দিতেন তাই পূর্ণ মাষ্টার মশাই—তাঁর গর্বই ছিল, 'আমার ইস্কুলের ছাত্ররা কোথাও গিয়ে বিপদে প'ড়বেনা, যে কোন চাকরী ক'রতে পারবে।'

আজ, হাইস্কুল কলেজের এই বন্যার মধ্যে ওসব ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে প'ড়েছে—মনে হয় মাইনর ইস্কুলে পড়া শুধু শুধু ক-টা বছর অনর্থক নষ্ট করা। আজ যখন গ্র্যাজুয়েট হওয়াটা ডালভাতের মত সহজ ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে, তখন প্রথম থেকেই হাইস্কুলে দেওয়া উচিত—এই সকলের ধারণা।

কিন্তু তবু, এখনও পুরোনো বাসিন্দা এমন আছেন, যাঁদের এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি মোটে ভাল লাগে না—আর তাঁদেরই ঐ সাতবট্টিটি ছেলে কোন মতে সেই ধারাকে বজায় রেখেছে।

তবে সেই পুরোনো আমলেও পূর্ণ মাষ্টার মশাইকে সবাই শুচি-বায়ু-গ্রস্ত ব'লত। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর খুঁতখুঁতুনির অন্ত ছিল না। শুধু প'ড়লে হবে না, নির্ভুল পড়া দিলেও হবে না—পড়ার পদ্ধতিটি পর্যন্ত ঠিক হওয়া চাই। সে খবর তিনি নিতেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁর শাসনের অন্ত ছিল না। হাতের লেখা ভাল না হ'লে চ'লবে না—কেরাণী গিরি ক'রে যখন খেতে হবে তখন ভাল হাতের লেখা, নির্ভুল যোগ-গুণ আর চোস্ত গ্রামারের জ্ঞান. এটা ত চাই-ই। (কেরাণীগিরি ছাড়া ছেলেদের অন্য কোন ভবিষ্যৎ তখন বাঙ্গালী বাপমায়েরা জানতেন না—সুতরাং আপনারা পূর্ণ মাষ্টার মশাইকে এ বিষয়ে অন্ততঃ মাপ ক'রবেন।) প্রত্যেকটি ছেলেকে ইংরেজী হাতের লেখা লিখতে হ'ত প্রত্যহ দু'পাতা ক'রে। সে লেখা বাঁকা হ'লে চলবে না, আই-এর মাথায় ফুট্‌কি দিতে ভুল হবে না এবং টি-এর মাথা কাটতে হবে নিয়মিত। হরফগুলি গোটা গোটা হওয়া চাই—সরু এবং হেলেপড়া হ'লে ব'লতেন, 'কী রেঁ, তোর অক্ষরগুলো রোগে ভুগে সবে পল্‌তার সুক্তো পথ্যি ক'রেছে বুঝি, তাই মাথা ঘুরে পড়ে গেছে?'

আজ আপনারা অনেকে শুভঙ্করীর নামও শোনেন নি কিন্তু পূর্ণ মাষ্টার-মশাইয়ের আমলে প্রত্যেকটি ছাত্রকে তা মুখস্থ ক'রতে হ'ত। এছাড়া ছিল বাংলা ও ইংরেজী ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলির জন্য কতকগুলি ছড়া—সেগুলি তাঁরই তৈরী, কিংবা গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত, তা ঠিক জানি না কিন্তু পরবর্তী জীবনে তা সত্যিই কাজে আসত। এমনি করে তাঁর ছাত্ররা বাংলা, অঙ্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে যতটা পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌ত অন্যদিকে ততটা পারত না। তা ছাড়া হাইস্কুলের চালবাজ ছেলেদের চাকচিক্য একটা আলাদা—সেখানে গিয়ে এই সব ছেলেদের বড় ম্লান মনে হ'ত নিজেদের, আর সেজন্য মনে

নে তারা দায়ী করত তাঁদের অভিভাবকদের এবং পূর্ণ মাষ্টার মশাইকে। অভিভাবকদের অনেকে পরে অনুতাপ করেছেন যে, গোড়া থেকে হাইস্কুলে না দিয়ে এই ক-টা বছর একেবারে মাটি হয়ে গেছে! লেখাপড়া শিখলেও কেমন যেন জন্তু থেকে গেছে—মানুষ হ'তে পারেনি!

এর একটা কারণ ছিল। মাষ্টার মশাই মনে ক'রতেন শুধু লেখাপড়া শেখানোতেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, সামাজিক জীবন যাপন করতে গেলে ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠিত হওয়া বেশী দরকার—আর সে ভার যেমন বাপ-মায়ের, তেমনি শিক্ষকদেরও। সেজন্য তাঁর বিধি-নিষেধের তালিকা ছিল একটু লম্বা। কী ভাবে চ'লতে হবে, কী ভাবে ব'লতে হবে, কথা বলবার সময় কতটা বিনীত হওয়া দরকার, গুরুজনদের মধ্যে কার কী রকম ভাবে আগে পিছে প্রণাম প্রাপ্য, চিঠি লেখার সময় কাকে কি পাঠ লেখা উচিত—এ সব সম্পর্কে তাঁর উপদেশের অন্ত ছিল না। শুধু উপদেশ দিয়েও ক্ষান্ত হ'তেন না, যতটা সম্ভব সেই-মত চালিয়ে অভ্যস্ত করিয়ে দিতেন। তার ফলে তাঁর ছেলেরা কেমন যেন শান্ত শিষ্ট হয়ে উঠত। আধুনিক শিক্ষক ও অভিভাবকরা কটাক্ষ ক'রে ব'লতেন, 'ওসব গুড়ি গুড়ি ভাব এখনকার দিনে অচল। অত, শান্ত শিষ্ট ছেলে কি আর জীবন যুদ্ধে দাঁড়াতে পারে!'

কিন্তু এসব কথা পূর্ণ মাষ্টারমশাই বুঝতেন না। তাঁর জীবন সীমাবদ্ধ ছিল ইস্কুলের কটা দেওয়ালের মধ্যেই। তাঁর প্রথম বয়সের দেখা ও চেনা পৃথিবী যে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে তা তিনি কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না। তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সেই প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগেই থেমে গেছে—একথা কে তাঁকে বুঝিয়ে দেবে? শুধু অভিজ্ঞতাই বা বলি কেন, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবন চ'লত স্বাস্থ্যতত্ত্বের পুঁথির পাতা ধ'রে। এমনি রুগ্ন ও শীর্ণ লোক—সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বাস্থ্যের বইয়ে উপদেশ মিলিয়ে খাওয়া শোওয়ার তত্ত্বাবধান ক'রতে প্রাণান্ত হ'ত, তবু তার বাইরের সহজ ও স্বেচ্ছাচারী জীবনযাত্রার কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না।

এ হেন পূর্ণ মাষ্টারমশাইকে যেদিন সত্যই এই ইস্কুল থেকে বিদায় নিতে হ'ল, সেটা তাঁর পক্ষে দুর্দিন বৈকি! বজ্র প'ড়বে প'ড়বে এ আতঙ্ক বহুদিন থেকেই ছিল কিন্তু এইবার তা সত্যই প'ড়ল। ছাত্ররা ও শিক্ষকরা সকলে মিলে সামান্য চাঁদা তুলে একটা বিদায় অভিনন্দনের ব্যবস্থা ক'রলেন। কর্তব্য বোধে গ্রামের নবাগত অনেকে, এমন কি নতুন হাইস্কুলের শিক্ষকরাও কেউ কেউ এলেন। বক্তৃতা হ'ল জোর —একটি বাঁধানো মোরাদাবাদী গড়গড়া উপহার দেওয়া হোল—জল-যোগেরও আয়োজন ছিল যৎকিঞ্চিৎ। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে কেমন একটা বিহ্বল ভাবে চেয়ে ব'সে রইলেন পূর্ণ মাষ্টারমশাই। উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর গলা কেঁপে উঠল, চোখের দৃষ্টি বার বার ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল —কিছুই গুছিয়ে ব'লতে পারলেন না। সভা ভাঙ্গতে বেরিয়ে যাবার সময় শেষ বারের মত ভাঙ্গা টেবিল, ছেলে-পড়া বইয়ের আলমারী এবং লোনাধরা অফিস ঘরের দেওয়ালের দিকে চেয়ে তাঁর বুক হুহু করে উঠল। তিনি কোনমতে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু এর পরেও সম্পর্ক কাটাতে পারেন নি একেবারে। এক একদিন ভাত খেয়ে দুপুরের দিকে চ'লে আসতেন এবং নিজে উপযাচক হ'য়ে অন্য কোন মাষ্টারের ক্লাসে পড়াতে ব'সতেন। ছাত্ররা কেমন পড়ছে এ কৌতূহল ত ছিলই—তাঁর পদ্ধতি থেকে তারা একেবারে বঞ্চিত না হয় বোধহয় এও ছিল তাঁর এভাবে আসার কারণ। অন্য মাষ্টাররা সবাই পুরানো লোক, তাঁরা কোন আপত্তি করতেন না কিন্তু

শগগিরই তিনি বুঝতে পারলেন যে নতুন হেড মাষ্টার এটাকে উপদ্রব
ব'লেই মনে করেন। তাঁর বয়স অল্প—পুরাতন পদ্ধতি সবটা তাঁর পছন্দ
হ'ত না। আবার তাঁর পদ্ধতিও পূর্ব মাষ্টারমশাইয়ের অসহ্য ব'লে
মনে হ'ত, তিনি গায়ে পড়ে হেড মাষ্টার মশাইকে উপদেশ দিতে যেতেন,
তাতে তাঁর মুখ-ভাব হয়ে উঠত অত্যন্ত কঠিন। অগত্যা এভাবে আসা
বন্ধ ক'রতে হ'ল। ইস্কুলের ছুটি হ'য়ে গেলে ইস্কুল বাড়ীটার চার পাশে
ঘুরে বেড়াতেন।

এধারে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর কিসে চ'লবে এ একটা সমস্যা হয়ে উঠল।
গ্রামের একটি ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে এক প্রকাশকের সঙ্গে
যোগাযোগ স্থাপন করে দিলেন। মনে হ'ল এতদিনের অভিজ্ঞতা
থেকে যদি পাঠ্যপুস্তক লেখেন, সে বই নিশ্চয় ভাল হবে, তাতে ক'রে
ভবিষ্যতেরও একটা সংস্থান হবে।

কিন্তু সেখানেও একটা মস্ত বড় গোলমাল বাধল। সিলেবাসে যা
আছে সে-মত বই তিনি লিখতে চান না, তাতে নাকি ছাত্রদের
সর্বনাশ হবে। সে কথাটা যদি বা বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এবং বইও
তিনি একখানা লিখলেন, ছাপবার সময় মহাগণ্ডগোল। ছ বার প্রুফ
নিয়েও শান্তি নেই, কেবল কাটছেন আর বদলাচ্ছেন, এক একটি শব্দ
নিয়ে হিসেবের শেষ নেই—হয়ত রাত দুপুরে ভাল একটা শব্দ মনে
প'ড়ল, তখনই প্রকাশকের বাড়ী। এমনি হয়রানি হয়ে প্রকাশক
কোনমতে একখানা বই ছেপেই ইস্তফা দিলেন। সোজা ব'লে দিলেন,
'আপনার সঙ্গে ব্যবসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' তা'তে
ক'রে আর বই লেখা বা ছাপার সম্ভাবনা ত গেলই—এ বইটাও এমন
কিছু কাটল না যাতে নাকি ওঁর সাংসারিক অভাব দূর হয়। ভাল
বই মাষ্টারমশাইরা পাঠ্য করেন না, করেন উপরোধ অনুরোধে ও

লেখকের নাম দেখে। মাইনর ইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেড মাষ্টারের বই বিলিতী ডিগ্রীওয়ালা অধ্যাপকের বইয়ের ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যেত —তার খবর কে রাখে!

তবুও দিন কাটে। সুখে হোক দুঃখে হোক, প্রায় অচল অবস্থাতে হোক্—দিন কাটেই। পূর্ণ মাষ্টার মশায়েরও মাসিক সাত টাকা পেনসনে আর বইয়ের যৎসামান্য আয়ে (বছরে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা) কোন মতে চলে। স্বামী-স্ত্রী—তবু এ আয়ে চলবার কথা নয়, এক ভাইপো আছে, সে বুঝি মাসে পাঁচ টাঁকা করে দেয়—সব মিলিয়ে নুনভাত হয়! নিজের বাড়ী বটে, মাটির ঘর হেলে প্রায় ভূমিসাৎ হবার দাখিল হয়েছে, সারাবার পয়সা নেই, চালে খড়ও দেওয়া হয় না। আগে আগে বাড়ীতে ব'সে তিন চার টাকার টিউশ্যানী ক'রতেন, এখন তাও পারেন না, ফলে অভাব আরও বেড়েছে।

তবু একটি একটি ক'রে তের বছর কেটে গেল। পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হ'ল। মাইনর ইস্কুলের নতুন যিনি সেক্রেটারী হয়েছেন, তাঁর কাছে ইস্কুলটা হ'য়ে পড়েছে প্রেষ্টিজের ব্যাপার। এটাকে যদি কোন মতে টেনে তুলতে পারেন তাহলে আসছে বছর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে তাঁর ভোট পাবার সম্ভাবনাটা পাকা হ'য়ে যায়। সুতরাং তিনি ইস্কুলটাকে বিজ্ঞাপন ক'রবার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন বহুদিন থেকেই—হঠাৎ পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের দিকে তাঁর চোখ পড়ে গেল। তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, তোড়-জোড় ক'রে চাঁদা উঠতে লাগল, তিনি নিজে সব চেয়ে বড় অঙ্কটি খাতায় বসিয়ে চাঁদার খাতা পত্তন ক'রলেন। স্থির হ'ল বিরাট ক'রে একটা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। সাত চল্লিশ বছর যিনি এই ইস্কুলে হেড

াৱী ক'রেছেন তাঁর জীবনের পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি—এ কি সোজা ! একটা কমিটি গঠিত হ'ল—কমিটি ঠিক ক'রলেন যে এই লক্ষে তাঁকে একটি 'পার্স' বা টাকার থলি উপহার দেওয়া হবে। একশ এক টাকা দেওয়া যায় তা হলে ত কথাই নেই—নিদেন একান্ন া। এ ছাড়া একটি মটকার ধুতি আহ্নিক করবার জন্য—এবং জোড়া ভাল খড়ম দিতে হবে। গ্রামের একটি ছোকরার তিন চারটি বতা সম্প্রতি কোন্ সাপ্তাহিক কাগজে ছাপা হয়েছে—তাকেই ধরা া অভিনন্দন পত্রটি লিখে দেওয়ার জন্য।

অখ্যাত ও অবজ্ঞাত মাষ্টার মশাইয়ের জীবনে এ শুধু আশাতীত —কল্পনাতীত ব্যাপারও বটে। উত্তেজনায় ভাগ্নীজামাইয়ের বাড়ী কে একটা দেশী কাপড় ধার চেয়ে নিলেন, ভাইপোর কাছ থেকে কখানা মটকার চাদর। তারপর অভিনন্দনের দিন বেলা তিনটার য়েই একটি ইস্কুলের ছাত্রকে সঙ্গে ক'রে এসে উপস্থিত হলেন। লেটিকে তিনিই ব'লে দিয়েছিলেন সকাল ক'রে আসতে—কত কাল ্লে পা দেন্নি, ঘুরে দেখবেন কী অবস্থা।

যথা সময়ে সভার কাজ শুরু হল। উদ্বোধন সঙ্গীত, উপস্থিত দ্রমহোদয়গণের বক্তৃতা, ছেলেদের আবৃত্তি, কবিতাপাঠ ও মানপত্র াঠের পর স্বয়ং মাষ্টারমশাই উঠলেন অভিনন্দনের উত্তর দিতে। য়সের জন্য কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও কম্পিত, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি গলা রিষ্কার ক'রে বলতে আরম্ভ ক'রলেন, 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়, দ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ এবং কল্যাণীয় ছাত্রগণ। আপনারা আজ াজ আমাকে যে সম্মান দেবার জন্য আহ্বান ক'রে এনেছেন আমি া তার যোগ্য নই তা আপনারাও জানেন। তবু আমি সেছি, তার কারণ আপনাদের আহ্বানে আমার প্রতি যে স্নেহ

প্রকাশ পেয়েছে তাকে উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই।' কিন্তু এ অনুষ্ঠান আমার পক্ষে যতই সম্মানজনক হোক, আজ আমি সুখী নই একথাটা আপনাদের কাছে স্বীকার না করে পারলাম না।'

এই পর্যন্ত ব'লে তিনি একটু থামলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত, একটা মৃদু গুঞ্জনও উঠল চারিদিকে কিন্তু পূর্ণ মাষ্টার মশাই তখনই আবার শুরু ক'রলেন, 'দেখুন—আমি আজ কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে না ব'লে পারছি না। তাতে যে অপরাধ হবে তা আপনারা মার্জনা ক'রবেন। আজ আমার পঁচাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হ'ল বলে আপনারা আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এত কাল আমার বেঁচে থাকা ঠিক হয়নি—বহু পূর্বেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ তা হ'লে আজ যা দেখলাম তা আর আমাকে দেখতে হ'ত না। এই ইস্কুলে আমি সাতচল্লিশ বৎসর কাজ ক'রছি, সাধ্যমত কখনও ফাঁকি দিইনি—যে ছাত্রদের ভার আমার উপর তুলে দেওয়া হয়েছিল তাদের যাতে মঙ্গল হয়, উন্নতি হয়, প্রাণপণে আমি সে চেষ্টাই ক'রেছি। কিন্তু আজ কী দেখলাম? সেই ইস্কুলের এ কি অবস্থা হ'য়েছে! যে নিমন্ত্রণ পত্রটি ছাপা হয়েছে তার রচনায় তিনটি ব্যাকরণগত এবং ছটি বানান ভুল। একে ঠিক ছাপার ভুল বলে মনে করা যায় না এ রচনারই ভুল। ইস্কুলের প্রবেশ-পথে যে লাল সালুর ওপর তুলোর অক্ষর দেওয়া সম্বর্ধনা-সূচক বস্ত্রখণ্ড টাঙানো হয়েছে, তাতেও বানান ভুল। যে ছেলেগুলি আমাকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল এবং যে ছেলেটি আজ আমাকে নিতে গিয়েছিল তারা সকলেই আমার বয়োকনিষ্ঠ এবং একজন ছাড়া কেউই ব্রাহ্মণ নয়, তবু তারা কেউ আমাকে প্রণাম করা উচিত ব'লে মনে ক'রলে না, হাতটা একবার ক'রে কপালে ঠেকালে মাত্র। এরা ভাল

ক'রে দাঁড়াতে শেখেনি; কথা কওয়া ত দূরের কথা। এখানে এসে দেখছি যে ছাত্রগণ শিক্ষকদের শ্রুতি-সীমার মধ্যেই প্রকাশ্যভাবে সিনেমা ফিল্ম এবং নটীদের কথা আলোচনা ক'রছে। তাদের যে সব বই বর্তমানে পাঠ্য আছে তার দু-চার খানা ওলটাতে গিয়ে নজরে প'ড়ল সব বই-ই তথ্যগত এবং ছাপার ভুলে পরিপূর্ণ। ইংরেজী বই যিনি লিখেছেন তিনি in the sun আর under the sun এই দুটি বাক্যাংশের অর্থগত তফাৎ অবগত নন। অঙ্কের বইতে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রতে গিয়ে ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তাই করা হয়নি। ভূগোলে লেখকের অবিশ্বাস্য অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম যে তাদের জ্ঞান কম ত বটেই— আগ্রহ আরও কম। পড়া বুঝবার কেউ চেষ্টাই করে না, মুখস্থ করার মত কিছু পেলে সেইটুকু শুধু মুখস্থ করে। হাতের লেখা অপাঠ্য, বানানে কণ্টাকাকীর্ণ। আমা[illegible] বেঁচে থেকে যে শিক্ষার এই অ[illegible] দেখতে হ'ল, তার জন্য সত্যই আ[illegible]র অনুতাপের শেষ নেই। যদি এই ব্যবস্থা হয় তাহ'লে এর উপর যে ইমারৎ গ'ড়ে [illegible] কি হবে? অন্য শিক্ষায়তনের [illegible] হচ্ছে জানি না—ক[illegible] কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এ শিক্ষা[illegible]নটি তুলে দি[illegible]

এই ব'লে, প্রায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বক্তব্য শেষ ক'[illegible] মাষ্টার মশাই ব'সে প'ড়লেন এবং একটু পরেই লাঠি ধ'রে ধ'রে বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

তাঁর প্রণামী বলে একশ টাকার [illegible] কোনমতেই সেটা তাঁকে নিতে রাজী ক[illegible]

সেক্রেটারী দাঁতে দাঁত চেপে বললে[illegible]

—শে[illegible]